# স্বস্তিকা

৬৫ বর্ষ, ২৮ সংখ্যা ।। ৪ মার্চ - ২০১৩ ।। ২০ ফাল্গুন - ১৪১৯ ।। দাম : সাত টাকা

# সূচীপত্র


**সম্পাদকীয়** □ ৫

**সংবাদ প্রতিবেদন** □ ৬-৮

**সরকারি মদতে ক্যানিং এখন পাকিস্তান** □ ৯

**খোলা চিঠি : মুখ্যমন্ত্রী খুশ, দেবেন এবার ঘুষ** □ সুন্দর মৌলিক □ ১০

**ঝাড়খণ্ডে রাষ্ট্রপতি শাসন : কেন্দ্রের স্বার্থপরতা স্পষ্ট** □ ড: নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত □ ১১

**মালদায় ঐতিহাসিক যুব সমাবেশ** □ তরুণ কুমার পণ্ডিত □ ১৩

**স্বামীজীর আশীর্বাদ না থাকলে আর এস এস এত বড় কাজ করতে পারতো না** □ স্বামী তত্ত্বজ্ঞানানন্দ □ ১৪

**মোহন ভাগবতের আহ্বান উদ্দীপ্ত যুব-সমাজ গ্রহণ করল শপথের অঙ্গীকারে** □ ড: তুষার কান্তি ঘোষ □ ১৫

**মালদায় যুব সমাবেশের নেপথ্যের কারিগর** □ জয়রাম মণ্ডল □ ১৭

**মনীষীদের দৃষ্টিতে প্রার্থনা** □ ২১

**হুগলী জেলার কেষ্টপুরে উত্তরায়নের মেলা** □ উজ্জ্বল কুমার মণ্ডল □ ২২

**বাংলার প্রথম মহিলা পেশাদার সাংবাদিক** □ মিতা রায় □ ২৬

**ভারতে সামাজিক বিপ্লব ঘটেছে** □ এম ভি কামাথ □ ২৭

**খরা ও রাজনীতির জাঁতাকলে নাভিশ্বাস মহারাষ্ট্রের পাঁচ জেলার** □ ২৯

**মহিলা সুরক্ষা আইন** □ সুব্রত ভৌমিক □ ৩০

**পেলে, মারাদোনার সমকক্ষ নয় মেসি** □ জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় □ ৩৯

**নিয়মিত বিভাগ**

**চিঠিপত্র : ১৯ □ □ ভাবনা-চিন্তা : ২০ □ □ নবাঙ্কুর : ২৪-২৫ □ অন্যরকম : ৩৩ □ □ পুস্তক প্রসঙ্গ : ৩৫ □ □ সমাবেশ-সমাচার : ৩৬-৩৭ □ □ শব্দরূপ : ৪০ □ □ প্রাসঙ্গিকী : ৪২**


**প্রচ্ছদ নিবন্ধ**

**মালদায় ঐতিহাসিক যুব সমাবেশ**


**সম্পাদক : বিজয় আঢ্য**

**সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য**

**প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত**

৬৫ বর্ষ ২৮ সংখ্যা, ২০ ফাল্গুন, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ

যুগাব্দ - ৫১১৪, ৪ মার্চ - ২০১৩

**দাম : ৭ টাকা**

**বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৩২৫ টাকা।**

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।



দূরভাষ : সম্পাদকীয় : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪২



**Postal Registration No.-**
Kol.RMS/48/2013-2015

R N I No. 5257/57



দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

টেলিফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৪১-৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

# স্বস্তিকা

## আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

### ‘পাকিস্তান’ ক্যানিং

হিন্দুরা কেবল কাগজ-কলমেই এদেশে সংখ্যাগুরু। নইলে সরকারি তোষণ-নীতির যূপকাষ্ঠে প্রতিনিয়ত বলি হতে হতে কবেই হিন্দুরা এদেশে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক বই তো কিছুই নয়। সাম্প্রতিক ক্যানিংয়ের ঘটনা পুনরায় চোখে আঙুল দিয়ে তাই প্রমাণ করল। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, এ কি ভারতবর্ষ নাকি পাকিস্তান? বিশ্লেষণ করছেন **তথাগত রায়, উপানন্দ ব্রহ্মচারী** ও আরও অনেকে।

*।। সত্বর কপি বুক করুন।।*


HB ®

INDIA'S NO. 1 IN
ISI MARKED
HEAVY PIPE FITTINGS

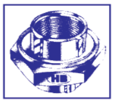
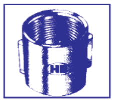

HB ® AN ISO 9002 CERTIFIED CO.

Authorised Distributor

NATIONAL PIPE & SANITARY STORES

54, N. S. Road
Kolkata-700001
Ph : 2210-5831/5833

3, Jadu Nath Dey Road,
Kolkata-12, Ph. 2215-6804,
Fax : 2212-2803

Sister Concern

Partha Sarathi Ceramics

4, College Street,
Kolkata-700012
Ph: 2241 6413 / 5986
Fax : 033-22256803
e-mail : nps@vsnl.net
website ;
www\nationalpipes.com

সানরাইজ ®

শাহী গরম মশলা

SUNRISE PURE ®

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

# সম্পাদকীয়

## হায়দরাবাদে বিস্ফোরণ ও সরকারের ভূমিকা

কয়েকদিন পূর্বেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিন্দু সন্ত্রাসবাদ লইয়া হাঁকডাক করিয়াছিলেন। তিনি এই অর্বাচীন মন্তব্যের জন্য ক্ষমা চাহিতেও বাধ্য হইয়াছেন। হায়দরাবাদের বিস্ফোরণ দেখাইয়া দিয়াছে কাহারা এই দেশে সন্ত্রাস করিয়া থাকে। ভোটের লালসায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কোনও একটি শ্রেণির পদবন্দনা করিতেই পারেন কিন্তু প্রকৃত সন্ত্রাসবাদী কাহারা তাহা ইতিমধ্যেই প্রমাণিত হইয়াছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিন্দু সন্ত্রাসবাদের ধুয়া তুলিয়া লস্কর-এ-তৈবা, সিমি, আই এস আই প্রমুখ জঙ্গি গোষ্ঠীগুলিকে উৎসাহ দিয়াছেন বলিয়াই জঙ্গি গোষ্ঠীগুলি বিপুল উৎসাহে হায়দরাবাদে বিস্ফোরণ ঘটাইতে পারিয়াছে। সুতরাং এই বিস্ফোরণের পরোক্ষ দায় তাই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীরও। কিন্তু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এই বিস্ফোরণ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, তাঁহার কাছে নাশকতার আগাম খবর ছিল কিন্তু তিনি জানিতেন না নাশকতার নিশানায় কোন শহর থাকিতে পারে। আফজল গুরুর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হইবার পরেই যে সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলি তাহাদের মনোবল চাঙ্গা করিবাব জন্য বিভিন্ন নাশকতামূলক কাজে লিপ্ত হইতে পারে তাহা সকলেই জানিতেন। অন্তর্ঘাতী শক্তি যে এই দেশের সবকিছু নজরে রাখিয়াছে তাহাও সুস্পষ্ট, কিন্তু তাহা রোধ করিবার ক্ষমতা এই সরকারের নাই। ইহার ফলেই যত্রতত্র বিস্ফোরণ ঘটিতেছে। এই নাশকতা শক্তির নজরকে প্রতিহত করিতে সরকারের তরফে প্রয়োজন হইতেছে আরও বেশি তৎপরতার। কিন্তু এদেশে এমন উদ্যোগের কথা কখনও শোনা যায় নাই। সমুদ্রপথে বিদেশি হানাদাররা বিনা বাধায় দেশের ভিতর প্রবেশ করিতে পারে। সংসদে হামলা চলে, জনবহুল অঞ্চলে যে কোনও সময় বিস্ফোরণ ঘটিতে পারে এবং এইসব ঘটিয়া যাইবার পরে মন্ত্রীরা জানান—খবর একটা ছিল কিন্তু সব খবর ছিল না। তাহা হইলে প্রশ্ন— কতটা জ্ঞাত হইলে প্রশাসন আগাম ব্যবস্থা লইতে সক্ষম? বিজেপি এই কারণেই বলিয়াছে, সন্ত্রাস দমনে ঢিলেঢালা মনোভাব দেখাইতেছে কেন্দ্র। আর সন্ত্রাস দমনে এই অ-গোছাল মনোভাবের কারণেই তাহারা বার বার ব্যর্থ হইতেছে। অবশ্য এই অভিযোগের মুখে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রুটিনমাফিক মন্তব্য করিয়াছেন সরকারের পক্ষ হইতে সন্ত্রাস দমনে সম্ভাব্য সবরকম প্রচেষ্টা করা হইবে। বিস্তর প্রাণহানির পর নিয়মমাফিক দুঃখ প্রকাশ করিয়া নিহতদের পরিবার পিছু কয়েক লক্ষ টাকা সাহায্যের আশ্বাস দিয়াই সরকার তাহার দায়িত্ব শেষ করিয়া থাকে। ইউপিএ সরকার হিন্দু সন্ত্রাসবাদ লইয়া যতটা উৎসাহী ততটাই নিস্পৃহ থাকে এই বিস্ফোরণগুলির তদন্তে। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক লাভ লোকসানের হিসাব করিয়া ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়া থাকে। বিশেষত যদি প্রমাণিত হয় অপরাধী প্রতিবেশী কোনও রাষ্ট্রের মদতপুষ্ট, তাহা হইলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক তথা সরকার কেমন যেন দ্বিধান্বিত হইয়া পড়ে। অপরাধীর দষ্টান্তমূলক শাস্তিই হইতেছে অপরাধ দমনের একমাত্র উপায়। দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি কথাটির অর্থ হইল—অপরাধের কারণে অপরাধীর শাস্তি যেন জনমানসে ভীতির উদ্রেক করে এবং অন্য কেহ এইরূপ অপরাধ করিতে সে সাহস না পায়। আমাদের দেশের সর্বোচ্চ আদালত তথা আইনি ব্যবস্থায় আসামিকে আত্মপক্ষ সমর্থন করিবার সম্পূর্ণ সুযোগ দিবার পরেই সব মামলার ফয়সালা করা হয় এবং অন্য দেশের সরকারও এই আইন ব্যবস্থাকে সম্মান করে। তবুও সন্ত্রাসবাদী হামলার তদন্ত ও বিচার প্রক্রিয়ায় টালবাহানা করা হইয়া থাকে। আফজল গুরুর ফাঁসির সাজা কার্যকর করিতে সময় লাগিয়াছে দীর্ঘ আট বছর। দেশের অভ্যন্তরেই যখন মানুষের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ এই সরকার তখন তাহার আর ক্ষমতায় থাকিবার কোনও অধিকার আছে কি?

### জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

*আমার ধারণা, চিকাগো ধর্মমহাসভার উদ্দেশ্য ছিল—জগতের সামনে অখৃশ্চান ধর্মসকলকে হীন প্রতিপন্ন করা। কিন্তু দাঁড়াল অখৃশ্চান ধর্মের প্রাধান্য—আর খৃশ্চান ধর্মই হীন প্রতিপন্ন হলো। সুতরাং খৃশ্চানদের দৃষ্টিতে ওই মহাসভার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়নি।*

*—স্বামী বিবেকানন্দ।*

# উত্তরবঙ্গে অপরাধ করে নেপাল-বাংলাদেশে গা-ঢাকা দিচ্ছে দুষ্কৃতীরা

**বাসুদেব পাল** ॥ পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে উত্তরবঙ্গের ভৌগোলিক গুরুত্ব অপরিসীম। তার কারণ, উত্তরবঙ্গ এবং লাগোয়া সিকিম মিলিয়ে চারটি দেশের রাজনৈতিক সীমানা স্পর্শ করেছে— বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান এবং চীনের দখলীকৃত তিব্বত। এর মধ্যে আবার শিলিগুড়ির পৃথক গুরুত্ব রয়েছে। শিলিগুড়ি করিডর-এর প্রস্থ ৫০ কিমিরও কম। একদিকে নেপাল অন্যদিকে বাংলাদেশ। দুষ্কৃতীরা সহজেই অপারেশন চালিয়ে বাংলাদেশ বা নেপালে চলে যেতে পারে।

আবার সীমাবর্তী ক্ষেত্র বলে চোরাচালানের দারুণ সুযোগও রয়েছে। এদিক থেকে বাংলাদেশে যাচ্ছে গবাদি পশু এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্য। ওদিক থেকে আসছে জালনোট, জেহাদি সন্ত্রাসবাদী এবং হাতিয়ার (আগ্নেয়াস্ত্র)। তবে সবথেকে বেশি সংখ্যায় আসছে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী (মুসলমান)।

এছাড়া সম্প্রতি অন্য একটি ঘটনা সবার নজর কেড়েছে। ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে পেশাদার অপরাধীরা এখানে এসে নানারকম অপরাধমূলক কাজকর্ম করছে। তারপর জনঅরণ্যে লুকিয়ে পড়ছে। শিলিগুড়ি বাসস্ট্যান্ড থেকে অথবা নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে ব্যাপক সংখ্যায় পর্যটকরা সিকিম এবং দার্জিলিং বেড়াতে যাচ্ছে। যাতায়াতের পথে শহরের বিভিন্ন হোটেলে দু'এক দিন অবস্থান করছে। সেই ভিড়ে মিশে থাকছে পেশাদার অপরাধীরা।

অতি সম্প্রতি নেপালের এক অবাঙালি ব্যবসায়ীকে অপহরণ করে খুন করা হয়। যদিও পরিবারের পক্ষ থেকে মুক্তিপণের ৫০ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছিল। পরে দুজন অপরাধীকে রেল পুলিশ দার্জিলিং মেলের কামরা থেকে বোলপুরে গ্রেপ্তার করে। ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে দুষ্কৃতীরা শিলিগুড়ি এবং তৎসংলগ্ন হোটেলগুলিতে ঘাঁটি গাড়ছে। পুলিশী নজরদারির ফাঁক-ফোকরের ফায়দা তুলে নিশ্চিন্তে হোটেলে গা-ঢাকা দিয়ে অপারেশন চালাচ্ছে। বিভিন্ন মহল থেকে এরকমই অভিযোগ। এদিকে শহরের হোটেল ব্যবসায়ীদের দাবি, বোর্ডারদের আবশ্যক নথিপত্র দেখা হয়। আবার পুলিশকেও তা দেখানো হয় বা জানানো হয়। শিলিগুড়ি হোটেল মালিক সংগঠনের কর্মকর্তা অরূপ

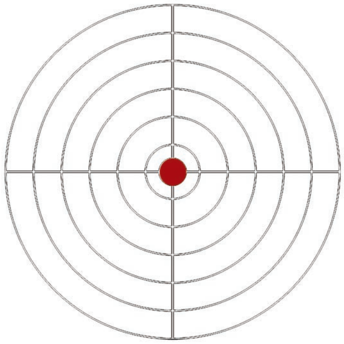

গোস্বামীর বক্তব্য— হোটেলে কারা থাকছেন সে ব্যাপারে আমরা পুলিশকে নিয়মিত জানিয়ে দিই। কিন্তু বোর্ডারদের নথিপত্র সবসময় যাচাই করা হয় না। শিলিগুড়ি পুলিশ-এর ডেপুটি কমিশনার ও জি পালের বক্তব্য, হোটেলগুলোতে পুলিশ নিয়মিত নজরদারি চালায়।

গত ৩ ফেব্রুয়ারি একটি হোটেলে অভিযান চালিয়ে ভক্তিনগর থানার সাহায্যে এন জে পি (নিউ জলপাইগুড়ি) আউট পোস্টের পুলিশ পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে। প্রাথমিক তদন্তের পরে পুলিশ জানতে পেরেছে, তারা ১৮ জানুয়ারি থেকে ওই হোটেলে ডেরা বেঁধে অপারেশন চালাচ্ছিল। ধৃতদের চারজনের বাড়ি উত্তরপ্রদেশে। একজন শিলিগুড়ির ডাকগ্রামের বাসিন্দা। ধৃতদের কাছ থেকে পুলিশ একটি ৯ এম এম বিদেশী পিস্তল, ১০২ কেজি গাঁজা এবং একটি টাটা সাফারি গাড়ি বাজেয়াপ্ত করেছে। ধৃতদের দু'জনের কাছে সেনাবাহিনীর পরিচয়পত্র পাওয়া গেছে। তাদের সঙ্গে কেন্দ্র সরকারের ভুয়ো চাকরি দেওয়া চক্রেরও যোগাযোগ আছে বলে খবর। সেরকম কিছু নথিপত্র থেকে এরকম ধারণা হয়েছে। ব্যাঙ্কে টাকা লেনদেনেরও হদিশ মিলেছে। তারা কুচবিহার জেলার মাথাভাঙ্গা থেকে গাঁজা নিয়ে সেগুলো অন্যত্র পাচারের ফিকিরে ছিল। কুচবিহার জেলার শীতলকুচি এলাকায় বাংলাদেশ সীমান্তে ব্যাপকহারে গাঁজা চাষ হয় বলে খবর। বেশ কিছুদিন পুলিশ তাদের গতিবিধির উপরে কড়া নজরদারি করছিল। এদিকে সম্প্রতি রাজস্থান থেকে আগত চারজন দুষ্কৃতী নয়াবাজারের এক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে ডাকাতি করে বলে অভিযোগ। এক্ষেত্রে দুষ্কৃতীরা প্রধাননগরের একটি হোটেলে আশ্রয় নিয়েছিল।

শিলিগুড়ির মাটিগাড়া এলাকার সুশ্রুতনগরে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল সংলগ্ন একাধিক হোটেলে কারা বাইরে থেকে এসে থাকছেন— তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। এলাকাবাসীদের অভিযোগ, রোগীর আত্মীয় বলে পরিচয় দিয়ে ভিন্‌রাজ্যের দুষ্কৃতীরা এসে আড্ডা গাড়ে। ওই হোটেলগুলোতে বাড়তি নজরদারি প্রয়োজন। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, পর্যটনকেন্দ্র ও উত্তরপূর্বের প্রবেশদ্বার হলো শিলিগুড়ি। এজন্য নানা প্রয়োজনে নানান প্রদেশের নানা ভাষাভাষী মানুষ এসে থাকেন। ওই ভিড়কে ব্যবহার করে দুষ্কৃতীরা গা ঢাকা দিয়ে তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করছে। হোটেল মালিকদের সংগঠনের নেতারা বলছেন, সচিত্র ভোটার পরিচয়পত্র, ড্রাইভিং লাইসেন্স, পাসপোর্টের মতো সচিত্র পরিচয়পত্র বোর্ডারদের কাছ থেকে দেখতে চাওয়া হয়। তবে ওইসকল পরিচয়পত্রে কোনওরকম কারসাজি মূল স্থানে হয়ে থাকলে তা যাচাই করে দেখার সুযোগ অনেক সময়ই থাকে না। এতদ্‌সত্ত্বেও সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের পাশাপাশি সকল বোর্ডারদের যাবতীয় তথ্য পুলিশকে নিয়মিত পাঠানো হয়।

এই বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরোর মধ্যে অপ্রিয় ঘটনা কিন্তু ঘটে যাচ্ছে।

সংবাদ প্রতিবেদন

# ভারতকে ইসলামি রাষ্ট্র করার লক্ষ্যে

# জেলায় জেলায় সংগঠন ছড়াচ্ছে সিমি

**প্রদীপ্ত দত্ত ॥** ভারতকে ইসলামিক রাষ্ট্র করার লক্ষ্যে জেলায় জেলায় সংগঠন ছড়িয়ে দিচ্ছে, 'স্টুডেন্ট ইসলামিক মুভমেন্ট অফ ইন্ডিয়া' সিমি। তাদের মূল লক্ষ্য ভারতকে 'দার-উল-ইসলাম' ওরফে ইসলামিক স্থানে পরিণত করা। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন জেলায় তারা তাদের শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে দিচ্ছে সুকৌশলে সঙ্ঘবদ্ধভাবে।

এই উদ্দেশ্য সাধনের মূল কেন্দ্রভূমি এখন কেরালা। এই তথ্য দিচ্ছে খোদ ভারতের গৃহমন্ত্রণালয়ই। এখানে 'জামাত-এ-ইসলামী,' 'পিপল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট', 'পপুলার ফ্রন্ট অফ ইন্ডিয়া'র সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়েছে সিমি। এখানকার তরুণদের আই ই ডি এস-এর ম্যানুফ্যাক্টচারিং ও হ্যান্ডেলিং এর জন্য শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। শেখানো হচ্ছে ক্যারাটে ও কেরালার প্রাচীন যুদ্ধকলাবিদ্যার। আর এর জন্য যে অর্থ খরচ হচ্ছে তার যোগান আসছে 'গালফ দেশগুলি' থেকে। নিষিদ্ধ হয়ে যাবার পর নতুন করে শক্তি সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে বিশ্বের বিভিন্ন মুসলিম সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়াচ্ছে তারা। যেমন রিয়াধের 'ওয়ার্ল্ড অ্যাসেম্বলি অফ মুসলিম ইয়ুথ' (WAMY), কুয়েতের 'ইন্টারন্যাশানাল ইসলামিক ফেডারাল--- সোস্যাল অরগানাইজেশন' আমেরিকার চিকাগো স্থিত 'কনসালটিভ কমিটি অফ ইন্ডিয়ান মুসলিম', পাকিস্তানের 'জামাত-এ-ইসলাম' বাংলাদেশের 'ইসলামি ছাত্র শিবির' ICS, ও হিজাব-উল-মুজাহিদিন। এইসব সংগঠনগুলি থেকে আসছে মূলত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সহযোগিতা।

গোয়েন্দা রিপোর্ট বলছে, সিমি যেসব প্রদেশ ও প্রদেশের জেলাগুলি থেকে সদস্য সংগ্রহ করছে, সেগুলি হলো উত্তরপ্রদেশ, দিল্লী, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট, কেরল, তামিলনাড়ু, বাংলা, বিহার, অসম প্রভৃতি। বিশেষ করে এইসব প্রদেশের মুসলিম অধ্যুষিত জেলাগুলি থেকে। যেমন উত্তরপ্রদেশের জৈনপুর, লক্ষ্ণৌ, আম্বেদকর নগর, আলিগড়, আজমগড়, সোনাউলি, জৈলাবাদ, রামপুর, মোরাদাবাদ, সাহারানপুর, ফৈজাবাদ, ভরতপুর, লক্ষ্মীপুর প্রভৃতি জেলায়। মহারাষ্ট্রের আওরঙ্গাবাদ, মালেগাঁও, থানে, বাংলার নদীয়া, দক্ষিণ ২৪ পরগণা এবং দক্ষিণ অসমের মুসলিম অধ্যুষিত জেলাগুলি থেকে। কেরলে ১২টির মতো সংস্থার আড়ালে সিমি কাজ করছে। তিরুবন্তপুরম, কোচি, মাল্লাপুরম প্রভৃতি জেলাগুলিতে শক্ত ঘাঁটি গাড়া হচ্ছে। সেই সঙ্গে বাড়ানো হচ্ছে ক্যাডার ও সদস্য সংখ্যা।

মহারাষ্ট্রের অওরঙ্গবাদ, মালেগাঁও, জলগাঁও, নাসিক, থানে, শোলাপুর, গড়চৌরলি, ননদেদ, অওরঙ, পুণে সিমি সদস্যদের শক্ত ঘাঁটি। অসম এবং বাংলায় সিমি মাদ্রাসা, মুসলিম ক্লাব, লাইব্রেরি এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের মাধ্যমে মুসলিম তরুণ সমাজকে নিজেদের দিকে টেনে আনার চেষ্টা চালাচ্ছে। দক্ষিণ ২৪ পরগণার মগরাহাটে সিমি 'ইসলামিক শিক্ষা শিবিরের' আড়ালে অবাধে কাজ করে চলেছে রাজ্য সরকারের চোখের সামনেই। মুসলিম উন্নয়নের নাম করে ঘনিষ্ঠতা বাড়াচ্ছে তৃণমূল, সিপিএমের কয়েকজন মুসলিম মন্ত্রী ও বিধায়কদের সঙ্গে। এখানকার বেশকিছু সদস্যকে একের পর এক উচ্চ-ইসলামিক শিক্ষা দেবার জন্য পাঠানো হচ্ছে বাংলাদেশের চট্টগ্রামে। যেখানে সৌদি আরবের টাকায় গড়ে উঠেছে বেশকিছু ইসলামিক শিক্ষাকেন্দ্র।

সিমির ছত্রছায়াই বাংলায় আবার নতুন করে মুসলিম লিগের আড়ালে গড়ে উঠেছে 'ইন্ডিয়ান ন্যাশানাল লিগ'। যারা দ্রুত সদস্য সংখ্যা বাড়াচ্ছে জঙ্গিপুর, মুর্শিদাবাদ, ডায়মন্ডহারবার, বসিরহাট, যাদবপুর, উত্তর ২৪ পরগণা ও কলকাতার মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে। বসিরহাট বিধানসভা আসনে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল লিগ-এর হয়ে লড়াইও করেন— হাসান সহিদুল্লা আসরফ। তিনি পেয়েছেন ৪,৭৮০টি ভোট। মধ্যপ্রদেশের ইন্দোর, উজ্জয়িনী, বহরানপুর, গুনা, নিমিকের মতো এলাকাগুলিতে ধীরে ধীরে সিমি তাদের রাজনৈতিক ভিত গড়ে তুলবার চেষ্টা করে চলেছে। সিমি নিষিদ্ধ হওয়ার আগে ৩৩টির বেশি মামলা দায়ের হয় সিমি সদস্যদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন জেলায়। উজ্জয়িনীর সফদর নাগবীর বিরুদ্ধেই ৪৯টির মতো মামলা দায়ের করা হয়। যিনি আবার সিমির গ্রুপ জেনারেল সেক্রেটারি। এতেই বোঝা যায় মধ্যপ্রদেশে সিমির ব্যাপকতা।

সিমি স্কুলের ছেলেদের জন্যেও গড়ে তুলেছে 'সাহিন ফোর্স' নামে একটি সংগঠন। সারাদেশে 'ইসলামিক সংস্কৃতি'র ছত্রছায়ায় যাদের শিক্ষা চলছে। কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ভারত সরকারের চোখের সামনেই।

সিমি প্রকাশিত করছে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ভারতের বিভিন্ন ভাষায়। প্রকাশ্যেই বিক্রি হচ্ছে এইসব পত্রিকা। পাওয়া যাচ্ছে ইন্টার নেট সংস্করণেও। যেমন মালায়লামে 'বিবেকম', তামিলে 'মাদল', বাংলায় 'রূপান্তর', গুজরাটে 'ইকবা', হিন্দিতে 'তেহেরিক', ইংরেজীতে 'মুভমেন্ট' 'সাইনটাইমস'। এইসব পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে ইসলামিক 'উম্মা' (মুসলিম ভ্রাতৃত্ব), ওসামা বিন লাদেনকে মানা হচ্ছে ইসলামের সত্যিকারের বিশ্বাসী। অস্বীকার করা হচ্ছে সংবিধান ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে। শুধুমাত্র ভারতকে 'দার-উল-ইসলাম' অর্থাৎ ইসলামিক স্থান বানাবার একমাত্র লক্ষ্যে।

ভারতের ইসলামিক ইতিহাস বলছে, সৈয়দ আহমদ, ইকবাল, ড. লতিফ, জিন্না প্রমাণ করে দিয়েছেন মুসলিমরা আলাদা জাতি, সংস্কৃতিতে জীবন চর্চায়, ধর্মে তারা হিন্দুদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। স্বাধীনতার প্রাক্কালে গান্ধীর মানবতা, জওহরলাল নেহরুর উদার সমাজতন্ত্রবাদ তাদের আকর্ষিত প্রভাবিত করেনি। তারা মুসলিমকেই জয়ী করেছিল। ধর্মনিরপেক্ষভাবে এরাষ্ট্র গড়ে উঠলেও স্বাধীনতার ৬০ বছর পরও কাশ্মীরের মুসলিম জনমানস ভারতবিরোধী শুধুমাত্র মুসলিম বোধের কারণেই। কাশ্মীরের নামে স্বাধীন কাশ্মীর দাবি করলেও সেখানে থাকবে না কাশ্মীরি পণ্ডিতেরা। এ কারণে কাশ্মীর উপত্যকা থেকে হিন্দু পণ্ডিতরা বিতাড়িত নিহত এবং শরণার্থী। নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থে রাজনৈতিক দলগুলি মুসলিমদের তোষণ করে চললেও ইতিহাস ও বাস্তব রাজনীতি প্রমাণ দিচ্ছে মুসলিম জনমানস কিছুতেই ভারতীয় বোধে একাত্ম হচ্ছে না, হবেও না। আর তাই দেশের মধ্যে উত্থান ঘটছে সিমির মতো ভারত-বিরোধী নানা মুসলিম সংগঠনের।

# সরকারি মদতে ক্যানিং এখন 'পাকিস্তান'

গূঢ়পুরুষের

কলম

হায়দরাবাদের জোড়া বিস্ফোরণ কাণ্ড ঘটিয়েছে পাক জঙ্গি সংগঠন লস্কর-এ-তৈবার ভারতীয় স্যাঙাৎ ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন। কর্ণাটকের বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি জি. কিষাণ রেড্ডি দাবি করেছেন লস্করের সন্ত্রাসবাদী আজমল কাসভ ও আফজল গুরুকে ফাঁসিতে ঝোলানোর বদলা নিতেই বিস্ফোরণ ঘটনো হয়। হায়দরাবাদের ধমাকার নিন্দনীয় নৃশংস ঘটনার খবরের আড়ালে চাপা পড়ে গেছে দক্ষিণ ২৪ পরগণার ক্যানিংয়ে মৌলবাদী মুসলিমদের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধানোর খবর। অন্তত রাজ্যের সংবাদমাধ্যম যদি যথাযথভাবে ক্যানিংয়ের নলিয়াখালির ঘটনাকে গুরুত্ব দিত তবে হয়তো অন্ধ্র সরকার ইসলামি জঙ্গিদের বিরুদ্ধে বাড়তি সতর্কতা নিতে পারতো। কারণ, অন্ধ্রের মুখ্যমন্ত্রী কিরণ কুমার রেড্ডি স্বীকার করেছেন যে ইসলামি জঙ্গিরা যে এমন একটা ষড়যন্ত্র করেছে আগাম খবর থাকা সত্ত্বেও তিনি গুরুত্ব দেননি। অনেকটা যেমন, পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল সরকার রাজ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধানোর ষড়যন্ত্রের আগাম খবর থাকলেও ব্যবস্থা নেয় না। পরে লস্কর-মুজাহিদিনদের হাতে হিন্দুদের প্রাণ ও সম্ভ্রম নষ্ট হলে সব দোষ তৃণমূলের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ সিপিএমের ঘাড়ে চাপিয়ে ইসলামি জঙ্গিদের আড়াল করে মমতার সরকার। যেমনটি রাজ্যের তৃণমূল শিল্পমন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় ক্যানিংয়ের ঘটনার পর করেছেন। তিনি বলেছেন, সিপিএম বিধায়ক রেজ্জাক মোল্লা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামায় প্ররোচনা দিয়েছেন। দুই রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ দলের কাজিয়ায় আজ বাংলার হিন্দু সমাজের মান ইজ্জত বিপন্ন। বেঁচে থাকার অধিকারই কেড়ে নিচ্ছে। মুসলিম ভোটের লোভে চলছে পথের কুকুরের মতো কামড়া-কামড়ি।

*মুসলিম তাণ্ডবে পুড়ল বাইকও।*

ক্যানিংয়ে হিন্দুদের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হিন্দু মহিলাদের শ্লীলতাহানির ঘটনাকে সংবাদমাধ্যমের চেপে দেওয়ার চেষ্টা সত্ত্বেও লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে। এই ঘটনায় ব্যাপক প্রাণহানি ঘটতে পারতো। প্রাণহানি ঘটেনি কারণ কয়েক শত স্বয়ংসেবক নিজেদের প্রাণ তুচ্ছ করে মুসলিম জঙ্গি দাঙ্গাবাজদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ঘটনাটি এই রকম— গত ১৮ ফেব্রুয়ারি সোমবার গভীর রাতে এক গান বাজনার অনুষ্ঠান দেখে মোটরবাইকে বাড়ি ফিরছিলেন স্থানীয় নারায়ণপুরের ধোয়াঘাটা গ্রামের মোল্লা রুহুল কুদ্দুস ও তার সাঙাৎ মোল্লা সিরাজুল ইসলাম। অভিযোগ, বাংলাদেশি একটি ডাকাতদল তাদের পথে আটকায়। তারা দুই মোল্লার সর্বস্ব কেড়ে নেয়। বাধা দিতে গেলে রুহুলকে তারা গুলি করে হত্যা করে। মোল্লা সিরাজুল পালিয়ে প্রাণ বাঁচায়। সিরাজুল পুলিশকে জানায় যে বাংলাদেশি মুসলিম ডাকাতরাই হামলা চালিয়েছিল।

কিন্তু তাতে কী হয়েছে! কট্টর জামাত সমর্থক স্থানীয় নলিয়াখালি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক আবদুল সালাম মোল্লা পরেরদিন মঙ্গলবার প্রকাশ্যে প্রচার করেন রুহুল কুদ্দুসকে হত্যা করেছে হিন্দুরা। কিন্তু হিন্দুরা হঠাৎ তাকে হত্যা করবে কেন? তার জবাব দেওয়ার প্রয়োজনবোধ করেনি সালাম মোল্লা। সম্ভবত বাংলাদেশের উগ্র মৌলবাদী সংগঠন জামাতকে আড়াল করতেই হিন্দুদের বিরুদ্ধে তিনি উস্কানি দেন। সালাম মোল্লার প্ররোচনামূলক বিবৃতির পরেই স্থানীয় এলাকার ১৩টি মসজিদ থেকে মাইকে বদলা নেওয়ার ডাক দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, এই আবদুল সালাম মোল্লা সংসদে জঙ্গি হামলার মূল ষড়যন্ত্রী আফজল গুরুর ফাঁসির পর নলিয়াখালিতে শোকসভার আয়োজন করেছিল। সেই শোকসভায় উপস্থিত কয়েক শত মুসলিম গ্রামবাসীকে সালাম মোল্লা বলে, 'ভারতীয় হিন্দুরা সকলেই কাফের। তাই হিন্দুরা আল্লার মহান

সেবক আজমল কাসভ এবং আফজল গুরুকে হত্যা করেছে। সাচ্চা মুসলমানরা এর বদলা নেবেই।' এরপরেই বাংলাদেশী ডাকাতদের গুলিতে রুহুল মোল্লার মৃত্যুর ঘটনায় সালাম মোল্লা সরাসরি হিন্দুদের দায়ী করে। দক্ষিণ ২৪ পরগণায় ঘুটিয়াশরিফ এবং সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ এলাকায় এখন উগ্রপন্থী মুসলিম সংগঠনের মুক্তাঞ্চল। আরব দেশের অর্থে তৈরি হয়েছে গ্রামে গ্রামে মসজিদ-মাদ্রাসা। জাল নোট ও বেআইনি অস্ত্রের কারবারের রমরমা চলছে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা জুড়ে। মুসলিম ভোট হারাবার ভয়ে বাম-ডান কোনও রাজনৈতিক দলই প্রতিবাদ করে না। পুলিশ চোরাকারবারিদের কাছ থেকে 'হপ্তা' পেয়ে চোখ বুজে থাকে।

মসজিদ থেকে ডাক শুনে কয়েক হাজার সশস্ত্র মুসলমান দুষ্কৃতিরা গার্ডেনরিচ-মেটিয়াবুরুজ এলাকা থেকে ট্রাকে চড়ে ক্যানিং-এ চলে আসে। যোগ দেয় স্থানীয় নলিয়াখালির দাঙ্গাবাজদের সঙ্গে। এরপরেই শুরু হয় হিন্দুদের গ্রামে গ্রামে হামলা। কমপক্ষে হিন্দুদের ৩০০টি বাড়ি আগুনে পোড়ায় দাঙ্গাবাজরা। এলাকার সবকটি মন্দির ধ্বংস করে দেওয়া হয়। 'আল্লা হো আকবর' ধ্বনি দিয়ে পেট্রল বোমা- বন্দুক নিয়ে ১৯ ফেব্রুয়ারি বেলা ১১টা থেকে দাঙ্গাবাজরা হামলা চালায় ধোপামোড়, হেরোভাঙা, গোলাদোহরা, গোপালপুর এলাকায় হিন্দুদের বাড়িতে। পেট্রল বোমা ব্যবহার করে জ্বালিয়ে দেওয়া হয় একের পর এক হিন্দু বাড়ি। ধ্বংস করা হয় হিন্দু পরিবারের সম্পত্তি। যেমন, নলিয়াখালি গ্রামের স্বচ্ছল হিন্দু পরিবার মণিমোহন মণ্ডলের বাড়ির সঙ্গে আগুন দেওয়া হয় তাঁর মুরগির খামারে। কমপক্ষে ৪০০ মুরগি মারা যায় আগুনে পুড়ে। স্থানীয় ঠিকাদার প্রশান্ত অধিকারীর নতুন মোটরগাড়ি জ্বালিয়ে দেয় দুষ্কৃতিরা। জাতীয় সাইক্লিং চ্যাম্পিয়ান চন্দনা মণ্ডলের মহার্ঘ্য বিদেশি রেসিং সাইকেল এবং তাঁর সমস্ত সার্টিফিকেট জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। আর এইসব তাণ্ডব প্রকাশ্য দিবালোকে কয়েক ঘণ্টা ধরে চলেছে পুলিশের উপস্থিতিতেই।

প্রশ্ন উঠেছে, দিনের বেলায় ট্রাকে চড়ে প্রায় হাজার খানেক সশস্ত্র মুসলিম দুষ্কৃতি মেটিয়াবুরুজ— গার্ডেনরিচ এলাকা থেকে ক্যানিং যাচ্ছে দাঙ্গা করতে তা চোখে দেখেও পুলিশ ও প্রশাসন নীরব ছিল কেন? নলিয়াখালিতে যখন বেছে বেছে হিন্দু বাড়ি আক্রান্ত হচ্ছে তখন সেখানে উপস্থিত ৩০ জনের একটি সশস্ত্র পুলিশ দল বাধা দিল না কেন?

এই প্রতিবেদন লেখার সময় নলিয়াখালির ১৮০০ হিন্দু গৃহহারা হয়ে গাছতলায় বাস করছেন। তাঁদের খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বেচ্ছাসেবকরা। রাজ্য বিজেপি-র প্রাক্তন সভাপতি তথাগত রায় এবং রাজ্য যুব মোর্চার সভাপতি অমিতাভ রায় একটি প্রতিনিধি দল নিয়ে ঘটনাস্থলে যান। পরে তাঁরা স্থানীয় সাংবাদিকদের জানান, ঠাণ্ডা মাথায় আগে থেকেই পরিকল্পনা করে মৌলবাদী মুসলিমরা হিন্দুদের বাড়িতে আক্রমণ চালিয়েছে। তা' না হলে ভোর সকাল ৬টায় রুহুল মোল্লার মৃতদেহ আবিস্কারের এক ঘন্টার মধ্যেই মেটিয়ারুজ-গার্ডেনরিচ থেকে সশস্ত্র দুষ্কৃতিরা ট্রাকে চড়ে ক্যানিং পৌঁছোয় কীভাবে এবং মোল্লার মৃতদেহ পড়ে থাকার কথা স্থানীয় জীবনতলা থানাকে জানানো হয় সকাল ৬টায়। পুলিশ মৃতদেহ সরায় বেলা ১১টার পরে। এতটা দেরি কেন হয়? পুলিশের এই গড়িমসির কারণেই হাজার হাজার মুসলিম জনতা ঘটনাস্থলে জমায়েত হয়। সকাল ১০টায় পরিস্থিতি স্থানীয় পুলিশের আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। চলতে থাকে হিন্দুবিরোধী স্লোগান। পথের ধারে দাঁড় করানো গাড়ি, মোটরবাইক ও অটোতে ভাঙচুর চালানো হয়। চলে অবাধ লুঠতরাজ। পুলিশের সামনেই একের পর এক হিন্দুবাড়িতে অগ্নি সংযোগ করা হয়। একটি হিন্দু বাড়িও আগুনের গ্রাস থেকে রক্ষা পায়নি। স্বাভাবিকভাবে আক্রান্ত হিন্দুরা প্রশ্ন তুলেছেন, 'আমরা কি পাকিস্তানে বাস করছি?'

## কলকাতায় জেহাদী তরঙ্গের অশনি সংকেত

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ২২ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় মুক্তিযুদ্ধে যারা বিরোধিতা করেছিল ও লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছিল তাদের বিচার শুরু হয়েছে। হাজার হাজার হিন্দু ও মুসলমানকে হত্যা করে পাক সেনা ও তার সমর্থনকারি বাংলাদেশি রাজাকার, আলবদরদের বিচার জরুরি ছিল যদিও বাংলাদেশে পাকিস্তানের প্রভাবে এ বিচার শুরু সম্ভব হয়নি। কিন্তু নতুন প্রজন্ম এই বিচার চাইছেন। শেখ হাসিনা সরকার তাদের বিচার শুরুও করেছেন।

এদিকে কলকাতায় উলেমা অল বেঙ্গল মাইনরটি যুব সংগঠন, সুন্নত-উল-জামাত, উলেমা পরিষদ ও মাদ্রাসার ছাত্ররা এই বিচার শুরুর বিরুদ্ধে জমায়েত করে। রাস্তাঘাট সব বন্ধ করে দেওয়া হয়, আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোস রোডে এই জমায়েত বাংলাদেশ ডেপুটি হাই কমিশনের সামনে ধর্না দেবার সিদ্ধান্ত নেয়। তারা শেখ হাসিনা সরকারের বিচার শুরু করাকে তুমুল গালিগালাজও করে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাবার পূর্বে চারশো পুলিশ-বাহিনী তাদের গতিরোধ করে।

এখন প্রশ্ন উঠছে, এরা কারা? নির্ভরযোগ্য সূত্রের বক্তব্য, যারা একদিন পাকিস্তানের হয়ে লড়েছিল তাদের জন্য কলকাতায় জমায়েত। কলকাতায় পাকিস্তানপন্থীরা তৃণমূল, সিপিএম ও কংগ্রেসের আশ্রয়ে সঙ্ঘবদ্ধ হচ্ছে, একথা প্রকারান্তরে স্বীকার করে নিচ্ছেন অনেক রাজনীতিকই, আর হিন্দুরা উট পাখির মতো বালিতে মুখ দিয়ে আছে, যেন ধর্মনিরপেক্ষরা বাঁচাবে!

# মুখ্যমন্ত্রী খুশ, দেবেন এবার ঘুষ

**মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**
**মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার,**

আহা। রাজ্যটা একেবারে বদলে গেল। মানে আপনি বদলে দিলেন। সবাই বলছে বন্ধ পালনের ছবি বদলাচ্ছে রাজ্যে। আর সেই ছবি দেখে আপনি খুশি। এবারে পরপর দু'দিন বন্ধ ছিল। প্রথম দিন কলকাতা শহরে ঘুরে দিনের শেষে মহাকরণে এসে যখন সেই খুশিই প্রকাশ করলেন আমি টিভিতে দেখলাম আর মোহিত হয়ে গেলাম। আপনি বললেন, সরকারি অফিসে হাজিরা থেকে পথে যানবাহন কিংবা সাধারণ মানুষের বের হওয়া সবই পুরনো ছবিকে বদলে দিয়েছে। বদলেছে দোকান-বাজার খোলার সংখ্যাও। আর এই ছবি বদলের কারিগরদের পাশে সরকার যে দাঁড়াবে সেটা বলে আশ্বাসও দিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

সবাই বলে আপনি নাকি খালি কান দিয়েই শোনেন এবং দেখেন। কিন্তু এবার আর সেটি বলা যাবে না।

শুধু কানে না দেখে ২০ ফেব্রুয়ারি দিনভর কলকাতায় টহল দিলেন আপনি মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং। অবশ্যই পিছে পিছে টিভি ক্যামেরার দল। সেই দলে মোসাহেবও আছে, আবার সমালোচক আছে। ওরা চ্যানেল, আমরা চ্যানেল সবাই দেখালো আপনি ঘুরছেন। আর দিনের শেষে যখন বললেন সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত বন্ধ বিরোধিতায় আপনি খুশি তখন আর কে কি ভেবেছে জানি না, আমি মনে মনে বলেছি ঠিকই তো। আপনি যখন বলেছেন গাড়ি চলেছে, তখন চলেছে। আপনি বলেছেন দোকান বাজার সব খুলেছে, তখন খুলেছে। মহাকরণে বেশিরভাগ দফতরে একশো শতাংশ হাজিরা দেখে আপনি খুশি হয়েছেন অতএব আমিও খুশি। আরে বাবা অত যুক্তির কথা ভাবলে চলে নাকি! একটু-আধটু মিছে কথা বলাটা সামান্য ব্যাপার। রাজাকে উলঙ্গ বলার

মতো শিশুদের বেশি পাত্তা না দেওয়াই ভালো। আর যারা বন্ধ সাফল্যের ছবি দেখিয়েছেন তাদের সোজা বলে দেওয়াই ভালো যে, 'ওসব সাজানো ব্যাপার।'

দিদি, আপনি ক্ষমতায় আসার পরই বলেছিলেন রাজ্যের কর্মসংস্কৃতি বদলে দেবেন। কিন্তু আপনি কদিন যেতে না যেতেই বুঝেছেন বাঙালিকে বেশি কাজ করতে না বলাই ভালো। বরং ছুটিছাটা দিয়ে, উৎসব-পার্বন দিয়ে মাতিয়ে রাখাই ভালো। সেটা আপনি দক্ষতার সঙ্গেই করেছেন। এবং করছেন। তাই আপনি যখন বললেন, বন্ধ করতে দেবেন না তখন আমি প্রমাদ গুনেছিলাম। কারণ, বাঙালি চিরটাকাল বন্ধ, ধর্মঘটকে পবিত্র এবং প্রাপ্য ছুটি বলেই মনে করে। আপনি সেই অধিকার হরণ করলে তারা যে খেপে উঠবে। তাই দেখলাম আপনি কেমন ঘুষ প্রস্তাবটা দিয়ে দিলেন। বলে দিলেন, যেসব সরকারি কর্মীরা বন্ধের দিন কাজ করেছে তাদের আপনি পুজোর সময় ছুটির প্যাকেজ দেবেন। আহা আপনার জয় হোক। বোনাসের থেকেও যে এ বড় পাওনা। দুপুরে ভাত ঘুম দেওয়ার ছুটি প্যাকেজ দীর্ঘজীবী হোক।

শুধু সরকারি কর্মীদেরই না দেখে একটু বেসরকারি ক্ষেত্রটাও দেখুন না দিদি। আরও আরও ভাইদের খুশি করুন না দিদি। প্লিজ।

মাইনে কাটার হুমকি দিয়েছেন। চাকরিতে ছেদ পড়ার হুমকি দিয়েছেন। তাতে কারও কারও মনে রাগ হয়েছে। কিন্তু ছুটি ঘুষ পেলে কেউ রাগ করবে না। আরও ঘুষের কথাও যেসব বলেছে তাও অন্য রাজ্যকে নকল করতেই হবে আজ না হোক কাল। দোকান খুললে ট্যাক্সে ছাড়। সরকারের যতই টানাটানি থাকুক তবু ট্যাক্সে ছাড়। হকারকে আরও বেশি করে ফুটপাথ দখল করার অনুমতি। অটোওয়ালাকে আরও যেমন খুশি করার ছাড়। সাবাস, দিদি সাবাস।

আপনি নিজেই বলেছেন, এই রাজ্যে চলে আসা বন্ধ সংস্কৃতি রাতারাতি মুছে ফেলা যাবে না। তবে পরিস্থিতি বদলাচ্ছে। ছবি বদলাচ্ছে। আর সেই বদলের জন্য আপনার ভূমিকাকে অগ্রাহ্য করা যাবে না। শাসনের পর প্রলোভন। নজির গড়বে পশ্চিমবঙ্গ। গড়বেই।

**—সুন্দর মৌলিক**

# ঝাড়খণ্ডে রাষ্ট্রপতি শাসন : কেন্দ্রের স্বার্থপরতা স্পষ্ট

ডঃ নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত

সকলেই জানেন যে, সম্প্রতি ঝাড়খণ্ডে সংবিধানের ৩৫৬ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রপতি-শাসন জারি করা হয়েছে। গত ৮ জানুয়ারি তারিখে মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি অনাস্থা জানিয়ে শরিকদল (জে. এম. এম.) রাজ্যপাল সৈয়দ আমেদকে চিঠি লিখেছিল যে, বিজেপি নেতৃত্বাধীন জোট-সরকারের থেকে এই দল সরে গিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী অর্জুন মুণ্ডা রাজ্যপালের হাতে তাঁর পদত্যাগ-পত্র তুলে দিয়ে অবিলম্বে বিধানসভা ভেঙে দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন। কিন্তু জে. এম. এম. রাজ্যপালকে অনুরোধ করেছিল তখনই বিধানসভা না ভাঙার জন্য— কারণ তাদের ইচ্ছে ছিল সেই বিধানসভা থেকেই নতুন একটা ক্যাবিনেট তৈরি করা।

অবশ্য এটা ঠিক যে, এই ধরনের ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ রাজ্যপাল মেনে নিতে বাধ্য নন— চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে তাঁরই হাতে। বিশেষ করে, তাঁকে কেন্দ্রেরও নির্দেশ মেনে চলতে হয়। তবে রাজ্যপাল চেয়েছিলেন, বিধানসভাকে জিইয়ে রেখেই রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হোক।

এই প্রসঙ্গে বৃটেনের ব্যাপারটা চলে আসে। তার কারণ আমাদের সংবিধান বৃটিশ ধাঁচেই রচিত হয়েছে। বৃটেনে রাজা/রাণী এই ধরনের পরামর্শ সাধারণত উপেক্ষা করেন না। হ্যারল্ড জে. ল্যাস্কি তাঁর 'অটোমেটিজম্' তত্ত্বের মাধ্যমে জানিয়েছেন যে, প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে রাজা/রাণী আইনসভা ভেঙে দিতে বাধ্য।

তবে ডঃ কীম্ বিষয়টাকে একটু অন্যভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে, একজন প্রধানমন্ত্রী এই ধরনের অনুরোধ প্রথমবার জানালে অবশ্যই রাজা/রাণী তাঁর সেই অনুরোধ মেনে নেবেন। অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে রাজা/রাণীর কোনও 'prerogative' নেই। কিন্তু সেটা বারবার হতে পারে না।

**কেন্দ্র অপেক্ষা করছে যাতে কংগ্রেসকে ক্ষমতায় আনা যায়। এক্ষেত্রে শুধু জে এম এম-এর স্বার্থ জড়িত থাকলে নিশ্চয় রাজ্যপাল বিধানসভাকে জিইয়ে রাখতেন না বা কেন্দ্র ব্যাপারটাকে এতদিন ঝুলিয়ে রাখত না। এই ব্যাপারে কেন্দ্রের স্বার্থপরতা ও ক্ষুদ্রবুদ্ধির দিকটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।**

নির্বাচনের পর সেই প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতায় ফিরে এসে কিছুদিনের মধ্যেই এই ধরনের অনুরোধ করলে তিনি তা অগ্রাহ্য করতে পারেন।

কিন্তু সবচেয়ে বাস্তবসম্মত বক্তব্য রেখেছেন স্যার আইভর জেকিংস্। তাঁর মতে, এটা শেষ পর্যন্ত নির্ভর করছে বাস্তব পরিস্থিতির ওপর। তিনি লিখেছেন রাজা/রাণী দেখতে পারেন কমন্সসভা না ভেঙে সেখান থেকেই নতুন কোনও ক্যাবিনেট তৈরি করা যায় কিনা— যদি সেটা সম্ভব না হয়, তাহলে তাঁকে কমন্সসভা ভেঙে নতুন নির্বাচনের ব্যবস্থা করতেই হয়।

লর্ড ল্যাসেল্স, লর্ড সিসিল প্রমুখ গুণীজনও জানিয়েছেন যে, এই ব্যাপারে রাজা/রাণী তাঁর প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ মেনে চলতে বাধ্য। ওয়েড-ফিলিপস্ তাঁদের গ্রন্থে আরেকটা কথা যোগ করেছেন। তাঁদের মতে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অগ্রাহ্য করার অর্থই হলো নতুন নির্বাচনের ব্যবস্থা করা। সেটা অবশ্যই একটা ব্যয়বহুল ব্যাপার। সুতরাং যদি বিভিন্ন সরকার গঠন করা যায়, তাহলে এই অনর্থক খরচ করে লাভ কি? বরং কমন্সসভাকে রেখে দেওয়াই ভাল।

এই ধরণের বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতেই ঝাড়খণ্ডের ব্যাপারটা বুঝতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভা ভেঙে দিয়ে রাজ্যে সংবিধানের ৩৫৬ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করার পরামর্শ দিয়েছিলেন ৭ জানুয়ারি তারিখে। এই পরামর্শ মেনে নিলে— (১) বিধানসভাকে ভেঙে দিতে হয় বা তাকে জিইয়ে রাখতে হয় নতুন সরকার গঠনের জন্য, (২) সংসদ রাজ্য বিষয়ে আইন রচনা করে, (৩) বাজেটও সংসদ পাশ করতে পারে, এবং (৪) রাজ্যের প্রশাসন রাষ্ট্রপতি, তথা কেন্দ্রের নির্দেশে চলে, রাজ্যপাল হয়ে ওঠেন শাসক।

ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীর মনে হয়েছিল যে, বিধানসভায় বিভিন্ন দলের যে অবস্থান, তাতে বিকল্প সরকার গঠনের ক্ষেত্রেও সম্ভাবনা নেই। ৮২ আসন-বিশিষ্ট রাজ্য-বিধানসভায় একটা স্থায়ী সরকার গঠন করার জন্য দরকার ৪২টা আসন। কিন্তু বর্তমানের দলগত অবস্থানটা লক্ষ্য করা যাক—

| দল | আসন |
|---|---|
| বিজেপি | ১৮ |
| জে. এম. এম. | ১৮ |
| কংগ্রেস | ১৩ |
| জে. বি. সি. | ১১ |
| আর. জে. ডি. | ৫ |

অবশ্য আরও আছে ছোটখাট কিছু দল। আগে বিজেপি-জে এম এম জোটে জে এন ইউ (৬ জন), জে ডি ইউ (২ জন) এবং দুই জন নির্দল সদস্য ছিলেন। কিন্তু জোট ভেঙে যাওয়ার পর নতুন ভাবে সরকার গঠনের কোনও সুযোগ মুখ্যমন্ত্রী অর্জুন মুণ্ডা দেখেননি। সেই জন্যই মনে হয়েছিল যে, বিধানসভা ভেঙে নতুন নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হবে— তার আগে জারি করা হবে রাষ্ট্রপতি শাসন।

কিন্তু ইতিমধ্যে রাজ্যপাল দুবার রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করার জন্য কেন্দ্রকে অনুরোধ করলেও তিনি চেয়েছিলেন বিধানসভাকে জিইয়ে রাখতে ('suspended animation') যাতে নতুন একটা সরকার গঠন করা যায়। বলা বাহুল্য, এটা ছিল জে এম এম-এরও অনুরোধ। আর এটাই ছিল কেন্দ্রেরও কাম্য, কারণ জে এম এম কংগ্রেসের সঙ্গেই জোট বাঁধতে চেয়েছে। কংগ্রেসকে ক্ষমতায় আনার জন্য কেউ নিয়েছিল কালহরণের নীতি। জে এম এম সুপ্রিমো শিবু সোরেন কংগ্রেসকে মুখ্যমন্ত্রিত্বের টোপও দিয়েছিলেন। কংগ্রেসের রাজ্য ইউনিটও সরকারে যেতে রাজি ছিল— তাদের তরফে হাইকম্যান্ডকে জানানো হয়েছিল যে, রাষ্ট্রপতি শাসন বা বিধানসভা ভাঙাটা তাদের পছন্দ নয়।

এই অবস্থায় কেন্দ্র অপেক্ষা করছে যাতে কংগ্রেসকে ক্ষমতায় আনা যায়। এক্ষেত্রে শুধু জে এম এম-এর স্বার্থ জড়িত থাকলে নিশ্চয় রাজ্যপাল বিধানসভাকে জিইয়ে রাখতেন না বা কেন্দ্র ব্যাপারটাকে এতদিন ঝুলিয়ে রাখত না। এই ব্যাপারে কেন্দ্রের স্বার্থপরতা ও ক্ষুদ্রবুদ্ধির দিকটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

রাজ্যের কংগ্রেস-কমিটি কেন্দ্রকে জানিয়েছে যে, রাষ্ট্রপতি শাসন বা বিধানসভা ভাঙাটা তারা চায় না— 'The state unit of Congress is not in favour of Precident's Rule or the disolvation of the Assembly।' কেন্দ্রেরও ইচ্ছে— কংগ্রেস ক্ষমতার আসনে থাকুক— ডঃ জে সি জোহারীর ভাষায়— 'to regain the paradise of power'— (ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট অ্যান্ড পলিটিক্স)। আসন্ন ৮২ আসনবিশিষ্ট বিধানসভার মাত্র ১৩টা আসন নিয়ে সুখের সরকার গঠন করা যায় না। তাই কেন্দ্র চেয়েছে আরও সময়— যদি 'হর্স্ ট্রেডিং'-দ্বারা অবস্থা অনুকূলে আনা যায়।

এটা লক্ষণীয় যে, কেন্দ্রে যে দল বা গোষ্ঠীই ক্ষমতায় এসেছে, ৩৫৬ নং অনুচ্ছেদকে তারা ব্যবহার করেছে নিজেদের স্বার্থে। ডঃ সুভাষচন্দ্র কাশ্যপ জানিয়েছেন যে, চুয়াল্লিশ বছরে নব্বই বার এই ক্ষমতা প্রয়োগ করা হয়েছে— (আওয়ার কন্‌স্টিটিউশান, পৃ. ২৪৪)। কিন্তু প্রায় সব ক্ষেত্রেই জড়িত ছিল শাসক-দল বা গোষ্ঠীর স্বার্থ। অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন ডঃ অনুপচাঁদ কাপুরও— (দ্রষ্টব্য, দ্য ইন্ডিয়ান পলিটিক্যাল সিস্টেম, পৃ. ৯৮)। এই কারণে এস এল সিক্রি মন্তব্য করেছেন যে, এই ক্ষমতা 'has been more abused than used'— (ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট অ্যান্ড পলিটিক্স, পৃ. ৯৮)।

অবশ্য ঝাড়খণ্ডে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নিজেই রাষ্ট্রপতি শাসন জারির জন্য সুপারিশ করেছিলেন। তবে তিনি চেয়েছিলেন বিধানসভা ভাঙা ও নতুন নির্বাচন। কেন্দ্র দলীয় স্বার্থেই বিধানসভাকে জিইয়ে রেখেছে।


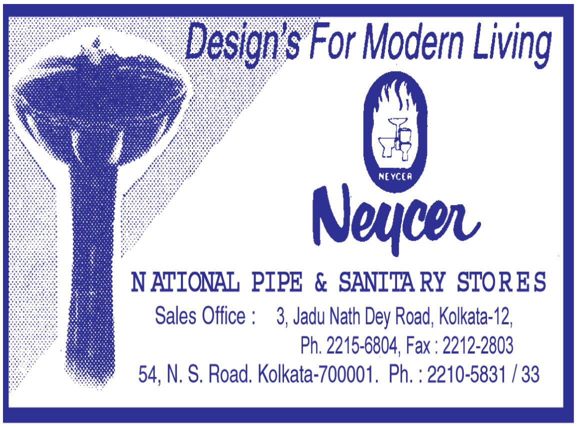


SATYA NARAYAN ACADEMY

C.B.S.E. AFFILIATED HIGHER SECONDARY
RESIDENTIAL CO-EDUCATIONAL WITH
SCIENCE & COMMERCE STREAM
BOOK YOUR SEAT IMMEDIATELY.

CAMPUS AT : RAMAKRISHNA NAGAR
BANKURA - 722155
CONTACT - 9433175048 / 9732063765

ADVT.

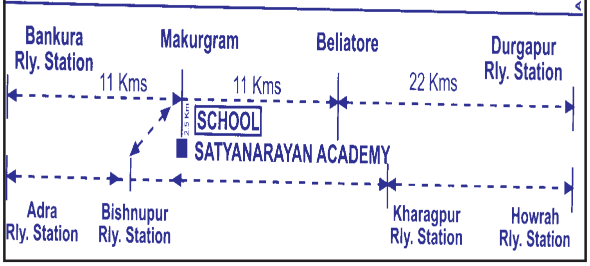

# মালদায় ঐতিহাসিক যুব সমাবেশ

**তরুণ কুমার পণ্ডিত**

প্রচণ্ড বৃষ্টি ও দুর্যোগকে উপেক্ষা করে হাজার হাজার যুবকের স্বতঃস্ফূর্ত যোগদানের মধ্যে দিয়ে গত ১৭ ফেব্রুয়ারি মালদা শহরের বৃন্দাবনী ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ঐতিহাসিক যুব সমাবেশ। স্বামী বিবেকানন্দের জন্মসার্ধশতবর্ষ সমারোহ সমিতির উদ্যোগে এই যুব সমাবেশে মালদা রঘুনাথগঞ্জ ও দুই দিনাজপুরের হাজার স্নাতক যুবক

*ঐতিহাসিক যুব সমাবেশে শপথের মুহূর্ত।*

ট্রেন, বাস, ট্রাক ও টেকারে করে 'জয়তু বিবেকানন্দ', 'এবার কেন্দ্র বিবেকানন্দ' ইত্যাদি জয়ধ্বনির মাধ্যমে স্বামীজীর নির্দেশিত দুর্গম পথে চলার প্রমাণ রাখলেন। দুটি সুসজ্জিত শোভাযাত্রা মালদা শহরের বিবেকানন্দ বিদ্যালয় ও হিন্দু স্কুলের সামনে থেকে দুপুর ১টাতে শুরু হয়ে মালদা শহর পরিক্রমা করে বৃন্দাবনী ময়দানে উপস্থিত হয়। বিশাল মঞ্চ থেকে তখন দেখা যাচ্ছে কাতারে কাতারে যুবকদের ব্যানার ও স্বামীজীর ছবিসহ স্লোগানের আওয়াজ। মঞ্চের নীচে স্বামীজী, ভগ্নী নিবেদিতা ও রামকৃষ্ণের আদলে সেজে থাকা ছোট্ট ছোট্ট ছেলেমেয়েদের দেখতে অনেকেই ব্যস্ত।

ঠিক বিকেল ৩টায় সভা শুরু হয়। মাঠ তখন প্রায় ভরে গেছে। হঠাৎ বৃষ্টির কারণে মাঠে জল জমার জন্য এবং কাদা থাকায় কিছুটা জায়গা খালি থাকলেও ভিজে মাটিতেই সকলে সারিবদ্ধভাবে বসে পড়েছিল। গোটা মাঠকে গেরুয়া পতাকাতে মুড়ে দেওয়া হয়েছিল। সংস্কার ভারতীর সদস্যরা উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন। তারপর অতিথিদের বরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত পথ নির্দেশ করেন। উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন শিল্প মন্দির বেলুড়ের অধ্যক্ষ স্বামী তত্ত্বজ্ঞানানন্দজী মহারাজ, মহানাম সম্প্রদায়ের প্রধান বন্ধুগৌরব ব্রহ্মচারী, ক্ষেত্র কার্যবাহ সত্যনারায়ণ মজুমদার, ক্ষেত্র সঙ্ঘচালক রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষেত্র প্রচারক অদ্বৈতচরণ দত্ত এবং সার্ধশতবর্ষ সমারোহ সমিতির সদস্য ডঃ তুষারকান্তি ঘোষ। যুব- সমাবেশের দিন সকাল থেকে মুষলধারায় বৃষ্টি কর্মকর্তাদের চিন্তার মধ্যে ফেলে দিলেও ২০০টি বাসে করে গেরুয়া পতাকা হাতে স্বামী বিবেকানন্দের অনুরাগী যুবকদের বাধাবিঘ্ন উপেক্ষা করে মাঠে যোগদান প্রমাণ করে এখন হিন্দু সমাজের মধ্যে মূল্যবোধ ও মনীষীদের শ্রদ্ধা করার মতো মানুষ রয়েছে। যে সমস্ত যুবকরা সকাল বেলাতে বাড়ি থেকে রওনা দিয়েছিল তাদের জন্য বাড়ি বাড়ি থেকে রুটি ও তরকারির ব্যবস্থা করা হয়েছিল। প্রকৃতি বিরূপ না হলে বৃন্দাবনী মাঠে ১২ হাজারের অধিক যুবকরা অংশগ্রহণ করত। হবিবপুর থেকে ৫০টি ভুটভুটি গাড়ি গেরুয়া পতাকা লাগানো অবস্থায় থেকে গেল। কেননা খোলা গাড়িতে ২ ঘণ্টা ধরে ভিজতে ভিজতে আসা সম্ভব নয়। অবশ্য তারা বাসে ও ট্রাকে অল্প সংখ্যায় হলেও উপস্থিত হয়েছিল। এইরকম অনেক বড় ও ছোট গাড়ি শেষ মুহূর্তে প্রচণ্ড বৃষ্টির জন্য আসতে পারেনি। তার মধ্যেও স্বস্তিকার স্টলে ভিড় এবং স্বামীজীর ছবি ও পুস্তক কেনার জন্য আগ্রহ সবার নজর কেড়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই সমাবেশের আগে উত্তরবঙ্গ প্রান্তের প্রান্ত বৈঠক গত ১৬ থেকে ১৮ তারিখ পর্যন্ত হয়েছিল এবং পরম পূজনীয় সরসঙ্ঘচালক সেই বৈঠকে কার্যকর্তাদের পথনির্দেশ করেন। প্রান্ত বৈঠক চলাকালীন একটি দুঃসংবাদ আসে। রামকৃষ্ণমঠ ও মিশন শিল্প মন্দিরের অধ্যক্ষ স্বামী তত্ত্বজ্ঞানানন্দজী মহারাজ যে গাড়ি করে কলকাতা ফিরছিলেন সেটি রাত্রি ১-৩০ মিনিটে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে এবং শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত তিনি গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন।

Ori Plast

P.V.C. Threaded Pipes. For deep Tubewell & general sanitation. Substitutes to conventionnal G.I. Pipes

Authrorised Distributor :

NATIONAL PIPE & SANITERY STORES

54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831, 2210-5833

3, Jadu Nath Dey Road, Kolkata-12, Ph. 2215-6804, Fax : 2212-2803

PARTHA SARATHI CERAMICS

4, College St. Kalkata-700012. Ph. :2241-6413/5986

# স্বামীজীর আশীর্বাদ না থাকলে আর এস এস এত বড় কাজ করতে পারতো না

স্বামী তত্ত্বজ্ঞানানন্দ

আমি এই সমাবেশ দেখে সত্যিই খুব অবাক হয়ে গিয়েছি। এরকম দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া, তার মধ্যে এত বিপুল সংখ্যক যুবক এসেছেন। শান্তভাবে বসে আছেন। যেখানে বসে থাকাটাই একটাই সমস্যার। স্বামীজীর প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা-ভক্তি না থাকলে এই জিনিসটা কোনওমতেই সম্ভব হোত না। আপনারা হয়তো আমাকে একজন সন্ন্যাসী হিসেবে দেখছেন। কিন্তু একদিন আপনাদেরই মতো আমি ছাত্র ছিলাম। স্কুল-কলেজে গিয়েছি। কিন্তু উচ্চতর শিক্ষার জন্য আমাকে বিদেশে যেতে হয়। সেখানে গিয়ে একজন সন্ন্যাসীর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়, যিনি ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যের শিষ্য। আমার দীক্ষা হয় তাঁর কাছেই। সেই কারণেই আমি ভক্তিভরে বলি যে স্বামীজী হলেন আমার প্রপিতামহ। আমার উচ্চারণ শুনে হয়তো আপনারা বুঝতে পারছেন যে আমি এই প্রদেশের লোক নই। আমার যেখানে জন্ম সেখানে আমার বাবা ছিলেন, ঠাকুর্দা ছিলেন। কিন্তু আমার আধ্যাত্মিক জীবন গড়ে দিয়েছিলেন স্বামীজী। তাই তাঁকে আমি আমার প্রপিতামহ বলেই মনে করি।

*অনুষ্ঠানে উপস্থিত স্বামী তত্ত্বজ্ঞানানন্দ।*

স্বামীজীর পেছনে ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তি। যিনি স্বামীজীকে বলেছিলেন যে মানুষের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবান লাভ। নিজে ভগবদ্দর্শন করে অন্যকে তা করানো। স্বামীজী মানুষের মধ্যেই ঈশ্বরের সন্ধান পেয়েছিলেন। তাই মানুষ তৈরির ওপর তিনি সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছিলেন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক পরম পূজনীয় গুরুজী গোলওয়ালকর দীক্ষা পেয়েছিলেন স্বামীজীর অত্যন্ত প্রিয় গুরুভাই স্বামী অখণ্ডানন্দের কাছে। তাঁর সম্বন্ধে অখণ্ডানন্দ স্বামী বলেছিলেন, ইনি হিন্দু সমাজকে রক্ষা করবেন। এটা আমি বলতে চাইছিলাম। কারণ অনেকে বলতে চান না। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের যে আদর্শ ও উদ্দেশ্য, তাতে বলতে পারি স্বামীজীর আশীর্বাদ না থাকলে আর এস এস এত বড় বড় কাজ কখনওই করতে সক্ষম হোত না। স্বামীজী কোনওদিন প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে জড়াননি। কিন্তু তাঁর আদর্শ বুকে ধারণ করেই লোকমান্য তিলক থেকে নেতাজী বৃটিশ শাসনের ভীত কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন।

যখন স্বামীজীকে বলা হয়েছিল, আপনি তো যোগী পুরুষ। আপনি ভারতকে স্বাধীনতা এনে দিচ্ছেন না কেন? স্বামীজী একমুহূর্ত ভেবে বলেছিলেন, আমি এখনই স্বাধীনতা এনে দিতে পারি। কিন্তু সে স্বাধীনতা ধরে রাখার মানুষ কই? তাই পরবর্তী পঞ্চাশ বছরে তিনি মানুষ তৈরির ওপর জোর দিয়েছিলেন। আমি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি যে ভারত তার চরিত্র, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, পরম্পরা ও ভালবাসা দিয়েই বিশ্বজয় করবে, তরবারি দিয়ে নয়। রাজা-বাদশাদের এদেশের মানুষ পুজো করেন না। এখানে পূজিত হন শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য, গুরুনানক, বেদ, উপনিষদ, গীতা। ধর্মের প্রতি এদেশের মানুষের আকর্ষণটা তাই সহজেই বোঝা যায়। স্বামীজী পাশ্চাত্যে গিয়ে এদেশের ধর্ম ও সংস্কৃতিকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন ভারতের যুব সমাজ একদিন বিশ্বকে পথ দেখাবেই। যুব-সমাজকে তিনি মোহবোধের ক্ষেত্র থেকে বের করে জগতের কল্যাণে নিয়োজিত করতে চেয়েছিলেন। নিজের সংস্কৃতি ও ধর্মের স্বরূপ জেনে বিশ্বকে জাগাবার দায়বদ্ধতা আজও ভারতের আছে। আমার সামনে বসে থাকা এই যুব-সমাজকে সেই রাষ্ট্র নির্মাণের পুরোধা রূপে দেখতে চাই। আমিও ছোটবেলায় সঙ্ঘের শাখায় গিয়েছি। এইরূপ অসংখ্য যুব চেতনার কাজ সঙ্ঘ করে চলেছে বলেই আমরা ভারতের উজ্জ্বল স্বরূপ দেখতে পাই।"

*(গত ১৭ ফেব্রুয়ারি মালদার বৃন্দাবনী মাঠে স্বামী তত্ত্বজ্ঞানানন্দ মহারাজ কর্তৃক প্রদত্ত ভাষণের সংক্ষেপিত রূপ।)*


নেত্রদান মহাদান

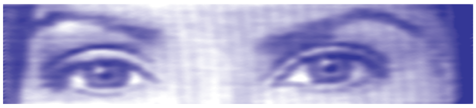

EYE BANK

23580201, 23341628, 23592931
Mobile - 9830333451

অনুসন্ধান ঃ 22181995, 22180387

সৌজন্যে ঃ কলাভারতী

# মোহন ভাগবতের আহ্বান উদ্দীপ্ত যুব-সমাজ গ্রহণ করল শপথের অঙ্গীকারে

ডঃ তুষার কান্তি ঘোষ

ইতিহাসের ছায়াপথে উত্তরবঙ্গের প্রাচীন পরিচয় যেমন স্পষ্ট তেমনই সর্বজনজ্ঞাত। বৈদিক, বৈদিকোত্তর সাহিত্য ও মহাকাব্যের পৃষ্ঠায় আখ্যাত পুন্ড্রবর্ধন, গৌড়, বরেন্দ্রভূমি, ত্রিস্রোতা, কোচ, সেচ-রাজ্য, করতোয়া ভূমি বড় পরিচিত ও গৌরবময় নাম। ওদের নিয়েই আজকের উত্তরবঙ্গ। বর্তমানে মালদহ, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, কুচবিহার ও দার্জিলিং নামে ছয়টি জেলা নিয়ে উত্তরবঙ্গ। এখানে আছে আটান্নটি থানা, সাত হাজার সাতশ বাষট্টিটি মৌজা আর পঁচিশটি শহর। এক অদ্ভুত মিলনক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল এই বিশাল জনপদগুলো। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল মুর্শিদাবাদের কিছু ক্ষেত্র। ছিল পনেরো হাজার।

১৭ ফেব্রুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দ জন্মসার্ধশতবর্ষ সমারোহ সমিতির ডাকে ডাকা হয়েছিল যুবকদের জন্য এ ঐতিহাসিক সমাবেশ। মালদহ নগরের বৃন্দাবনী ময়দান— যে ময়দানে একদিন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, নেতাজী সুভাষ, শ্যামাপ্রসাদ প্রমুখ অজস্র জাতীয় নেতার কম্বুকণ্ঠ শোনা গিয়েছে— সেই স্থানেই এসেছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক পূজনীয় শ্রী মোহনরাও ভাগবত। আর ছিলেন বেলুড় মঠের পলিটেকনিক কলেজের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী তত্ত্বজ্ঞানানন্দ মহারাজ।

১৬ ফেব্রুয়ারি থেকেই ছিল টানা দুর্যোগ ও অবিরাম বর্ষণধারা। ১৭ তারিখে এই বর্ষণ ধারা আর শীতকে উপেক্ষা করেই উত্তরবঙ্গ জড়ো হয়েছিল মালদহে। সিক্ত ও শীতার্ত যুব সমাজের অনুশাসন বদ্ধ হয়ে বৃষ্টিভেজা মাঠে তপস্বীর মতো বসে থাকা দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন স্বামী তত্ত্বজ্ঞানানন্দ

*অনুষ্ঠানে ভাষণরত ডঃ তুষারকান্তি ঘোষ।*

মহারাজ। তিনি যুব সমাজকে আহ্বান করে বললেন— ‘‘একদিন আমি আপনাদেরই মতো যুবক ছিলাম, ছিলাম স্বয়ংসেবক। বিবেকানন্দের বাণীর জীবন দর্শন খুঁজে পেয়ে চলে এসেছি স্বামীজীর কর্মযজ্ঞে অংশগ্রহণ করতে। স্বামীজী আমার প্র-পিতামহ। আমার দীক্ষাদাতার পর্যায় অনুসারেই আমার এই সম্বোধন। স্বামীজী আধ্যাত্মিক পুরুষ ছিলেন— তাই তাঁর আধ্যাত্মিকতা ছিল জগতের কল্যাণের জন্য। তিনি বিশ্বাস করতেন ভারতের যুব সমাজ একদিন বিশ্বকে পথ দেখাবে। যুব সমাজকে তিনি মোহবোধের ক্ষেত্র হতে বের করে জগত কল্যাণে নিয়োজিত করতে চেয়েছিলেন। ভারতের সংস্কৃতি ও ধর্মের স্বরূপ জেনে বিশ্বকে জাগাবার দায়বদ্ধতা আজও ভারতের আছে। আমার সামনে বসে থাকা এই যুবসমাজকে সেই রাষ্ট্র গঠনের পুরোধা রূপে দেখতে চাই। এইরূপ অসংখ্য যুব চেতনার কাজ সংঘ করে চলেছে বলে আমরা ভারতের উজ্জ্বল স্বরূপ দেখতে পাই।’’ স্বামী তত্ত্বজ্ঞানানন্দের বাণীতে যুব সমাজ সেদিন সত্যিই উদ্দীপ্ত হলো।

পূজনীয় সরসঙ্ঘচালক শ্রী মোহনরাও ভাগবত যুব সমাজকে দিশা দিলেন। তাঁর প্রেরণাদায়ক ভাষণ যুব সম্প্রদায় তথা উপস্থিত সুধীবৃন্দকে আপ্লুত করে তুলেছিল। ভাগবতজী বললেন, ‘‘আজ সারা দেশে বিবেকানন্দের জন্মসার্ধশতবর্ষের সমিতির মাধ্যমে বিভিন্ন কার্যসূচী পালন করা হচ্ছে। আজ সকলেই বক্তব্যের মধ্যে স্বামীজীর প্রসঙ্গ আনেন। কেউ কেউ স্বামীজীকে শুধু নিজেরই মনে করেন। এই দৃষ্টি কোনও সঠিক নয়। স্বামীজীর জীবন প্রবাহ আজ বিশ্বের সঙ্গে একাত্মভাবে যুক্ত হয়ে গেছে। স্বামীজী জন্মেছিলেন ভারতের পরম্পরাগত আদর্শের প্রেরণা ভূমিতে। তাঁর লক্ষ্য ছিল ভারতের এই বিশ্বভাবনা, ভারতীয় সংস্কৃতির দিব্য স্বরূপ বিশ্বে মেলে ধরার। তিনি বিশ্বাস করতেন এই ভারতবর্ষই ভোগবাদী পৃথিবীকে

চলার রাস্তা দেখাবে।

স্বামীজীর জীবনকালে ভারতবর্ষ দাসত্বের শিকলে বাঁধা ছিল। আজ দাসত্বের যুগ চলে গেছে— কিন্তু দাসত্বের ফেলে যাওয়া অভিশাপ হতে আজও ভারতের সমাজ সম্পূর্ণ ভাবে মুক্ত হতে পারেনি। স্বামীজী চেয়েছিলেন দাসত্ব থেকে ভারতের মুক্তি। স্বাভিমানী জীবন ও দেশের প্রতি অস্মিতাবোধ না সৃষ্টি হলে চিন্তাধারায় দাসত্বের ভাব থেকে যায়। স্বামীজী দেশের অস্মিতা জাগরণের জন্য এক গল্পের উদাহরণ দিতেন। এক সিংহশিশু ছাগলের পালে মানুষ হয়েছিল। ফলে ক্রমে ক্রমে তার সিংহত্ব বিমর্জিত হয়ে যায়। ছাগলের মতো সেও নিজেকে শক্তিহীন অবলা প্রাণী বলে মনে করতে থাকে। একদিন এক সিংহ তাকে নদীর তীরে নিয়ে গিয়ে তার চেহারা দেখিয়ে তাকে ক্লীবত্বের জগৎ থেকে মুক্ত করে। স্বামীজীর জীবন দর্শন, স্বামীজীর কর্মপ্রবাহ, স্বামীজীর বিশ্ববিজয়ের স্মরণ আমাদের এই দাসত্বের প্রভাব থেকে মুক্ত করবে।

ভারতবর্ষ পঁচিশ বছর ইসলামের ও আড়াইশ বছর ইংরেজের অধীন ছিল। কিন্তু ভারতবর্ষের সমাজ এই পরাধীনতা কখনও মেনে নেয়নি। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে পরাধীন মুক্তির ঘটনা ঘটতো। দেশ যখন নিজেদের গৌরব ও পরম্পরার মধ্যে প্রেরণা খুঁজে পায় তখনই তার চিত্ত-প্রবৃত্তিতে স্বাধীনতার কুসুম ফোটে।

এখন সারা পৃথিবীতে এক নতুন সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা চলছে তার নাম গ্লোবালাইজেশন অর্থাৎ বাজারের মনোবৃত্তি নিয়ে পৃথিবীর সম্পর্ক। ভারত তো জীবকে শিব জ্ঞানে সেবা দিয়েছে। বণিকরাজ প্রতিষ্ঠা করেনি ভারত। সারা বিশ্বকে আত্মার আত্মীয় বলে মনে করেছে 'বসুধৈব কুটুম্বকম্'। আজও এই দৃষ্টিকোণের জন্য সারা পৃথিবী ভারতকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে।

আজ ভারতের প্রতিটি মানুষকে নিজের জীবনে সেই গৌরবের অনুভূতির প্রকাশ ঘটাতে হবে। ভারতবর্ষের সমস্যা অনেক। সেই সব সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে যুব সমাজকে— দেশকে। বিবেকানন্দ এই মুখোমুখি দাঁড়াবার শিক্ষা পেয়েছিলেন কাশীতে। অসংখ্য বাঁদর তাঁকে তাড়া করেছিল। প্রাণভয়ে তিনি ছুটছিলেন। এক প্রবীণ সন্ন্যাসী তাঁকে রুখে দাঁড়াতে বললেন এবং বাঁদরেরা স্বামীজীর ওই রুদ্রমূর্তিতে ভয় পেয়ে পালালো।

আজ হিন্দুসমাজের অজস্র সমস্যা। সব চাইতে বড়ো হতাশা যে হিন্দু সমাজের এক শ্রেণীর লোক নিজেরাই আক্রমণ করেন হিন্দুসমাজকে। এটাও কিন্তু স্বার্থকেন্দ্রিক। ভারতবর্ষের বিশাল সমাজ আজও কিন্তু আছে বলেই ভারতের অস্তিত্ব আছে। প্রাচীন পরম্পরার সঙ্গে বিশ্বের কল্যাণের ভাবনা আছে।

আমাদের জীবন কিন্তু ব্যক্তিগত সুখসমৃদ্ধির জন্যই নয়। শুধু নিজের পরিচয়ের জন্যও নয়। এত অর্থ রোজগার এত সমৃদ্ধি যদি রাষ্ট্রের কাজে না লাগে তবে সমাজ জাগ্রত হবে না। রাজপুতানার ভাবশাহ নিজের অর্জিত সকল অর্থ ও সম্পদ রাণা প্রতাপের হাতে তুলে দিয়েছিলেন--- স্বাধীনতার জন্য, রাষ্ট্রধর্মের জন্য তাই তিনি আজও বেঁচে আছেন সমাজের সর্বত্র।

বিবেকানন্দকে আমরা স্মরণ করি কেন? তিনি কি আমাদের গ্রামের লোক? না আমরা তাঁকে দেখেছি? এই প্রশ্ন একদিন শেষাদ্রি এক যুবককে করেছিলেন— কারণ সেই যুবক শেষাদ্রিজীকে প্রশ্ন করেছিলেন বিবাহ না করলে তাঁর বংশধরেরা তাঁকে স্মরণে রাখবে না। মানুষ তাঁকেই স্মরণ করে যিনি সমাজ, রাষ্ট্র, বিশ্বের জন্য কল্যাণসাধন করেন। তাই আজ অতি স্বার্থপর লোকও তার সন্তানকে বিবেকানন্দ, তিলক, চন্দ্রশেখর আজাদের জীবন কথা শোনায়। চৌদ্দ বছর বনে বাস করা রামচন্দ্রের জীবন কাহিনী থেকে প্রেরণা নিতে বলে।

পরাধীন ভারতে স্বামীজী যুবকদের উপর পূর্ণভাবে আস্থা রেখেছিলেন তাই তারা স্বামীজীর আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন, স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছেন, খণ্ডিত হলেও দেশকে স্বাধীন করেছেন। কিন্তু আজও দেশ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়নি সমাজে অসংখ্য সমস্যা। এর মধ্য হতে দেশকে গঠনের জন্য এগিয়ে আসতে হবে। গত ২৫ ডিসেম্বর আপনারা সব শপথ গ্রহণ করেছিলেন দেশ ধর্ম গঠনের। এই আহ্বান পৌঁছে দিতে হবে যুবা-আয়ামে (যুবশক্তি), মহিলা-আয়ামে (সম্বর্ধিনী), প্রবুদ্ধ ভারতে, গ্রামায়ণে আর জনজাতি-আয়ামে ভারত গঠনের অস্মিতা রূপে।

স্বামীজী গৌরবময় ভারতের স্বপ্ন দেখতেন— একদিন ভারতমাতা পূর্বাপর হতেই তেজস্বিনী হয়ে পৃথিবীতে জাগ্রত হয়েছেন। আমরা এই স্বপ্নের সাকার রূপ দেব। আজকের যুব সমাজ এই শপথের বার্তাবহ আলোকবর্তিনী বহন করবেন।"

রাষ্ট্রবন্দনা বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতের মাধ্যমে শেষ হয় সেদিনের কর্মসূচী।

উত্তরবঙ্গের অজস্র জনপদে অজস্র শ্রেণীর বসবাস। তাদের নিজের চাহিদা ও দাবি-দাওয়ার শেষ নাই। পার্বত্যভূমি থেকে সমতল— রাজনৈতিক বাতাবরণ অসহিষ্ণু হলেও এই সমাবেশে এসেছিলেন সর্ব শ্রেণীর মানুষ। বিবেকানন্দ সকলের। রাষ্ট্র গঠনের যে আহ্বান পূজনীয় ভাগবতজী রাখলেন উদ্দীপ্ত যুবসমাজ তা গ্রহণ করল শপথের অঙ্গীকারে।

সনাতন ধর্মের মহানুভবতাকে তারা গ্রহণ করলেন হৃদয় দিয়ে— কাউকে আঘাত দিয়ে নয়। ধর্ম সমাজকে গঠন করে--- আলোক রশ্মি দিয়ে অন্ধকারকে দূর করার বাসনা নিয়ে— যেখানে থাকে চৈতন্যের প্রদীপ্ত শিখা। এই শিখাই বিতরিত হলো যুব-সমাজের জন্য।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের
মুখপত্র
প্রণব
পড়ুন ও পড়ান

# মালদায় যুব সমাবেশের নেপথ্যের কারিগর

জয়রাম মণ্ডল

গত ১৫ ফেব্রুয়ারি সরস্বতী পূজার দিনে মালদা স্টেশনে নেমে রিক্সায় চেপে সঙ্ঘ (আর এস এস) কার্যালয়ে যাচ্ছি ২৩ নেতাজী মোড়ে মালদা সঙ্ঘের কার্যালয়। যেতে যেতে রিক্সাওয়ালার সঙ্গে কথাবার্তা হচ্ছিল। রিক্সাওয়ালার নাম যদুনাথ রায়। যদুনাথকে জিজ্ঞেস করি, দেখে মনে হচ্ছে ২৩ ফেব্রুয়ারির উপনির্বাচনকেও ছাপিয়ে গেছে বিবেকানন্দের যুব সমাবেশ!

যদুনাথ বলল, তা বটে। স্বামীজী তো রাজনীতি করেননি।

তবে স্বামীজী কি করতেন?

বাবু, বিবেকানন্দ তো দেশ গঠনের কাজ করেছেন। আর নেতারা দেশকে ভেঙে টুকরো করেছেন।

উপনির্বাচনে হোর্ডিং পোস্টার বেশি চোখে পড়ছে না কেন?

সরকারি আইন বড্ড কড়াকড়ি। নির্বাচন কমিশন রাজনৈতিক দলের পতাকা পোস্টার, হোর্ডিং রাতের মধ্যেই তুলে নিয়ে গেছে। স্বাভাবিকভাবেই তাই যুব সমাবেশের পতাকা, হোর্ডিং, ব্যানার গেট চোখে পড়ছে। যুব সমাবেশকে কেন্দ্র করে মালদা শহর যেন গেরুয়ানগরী হয়ে উঠেছে।

মালদা শহরকে গেরুয়া নগরীর তৈরির পিছনে দুজনের নাম উল্লেখ না করে পারছি না। একজন বিধান মণ্ডল আর দ্বিতীয়জন দীপক ঘোষ। তাদের কাজই ছিল পতাকা তৈরি করা এবং জোগান দেওয়া। মালদা জেলায় এরা ৬০০০ পতাকা সাপ্লাই করেছে। বিধান মণ্ডল আবার একটি খণ্ডের (অঞ্চলের) সঙ্ঘের শারীরিক প্রমুখ। ছোটবেলাকার স্বয়ংসেবক, খুব স্মরণশক্তি। সঙ্ঘশিক্ষা বর্গে ১০৮ জনেরই নাম ধরে ডাকতে পারতো।

স্বামী বিবেকানন্দের সার্ধজন্মশতবর্ষ উপলক্ষে ১৭ ফেব্রুয়ারি মালদার বৃন্দাবনী পার্কে সঙ্ঘের মালদা ও দিনাজপুর বিভাগের (সরকারি ভাবে মালদা, উত্তর দিনাজপুর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা) এক বিশাল সমাবেশ ছিল। স্থির হয় ১৫ হাজার যুবকের সমাবেশ হবে। সেই সমাবেশে সঙ্ঘের পূজনীয় সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত উপস্থিত থাকবেন। ১৫ হাজার যুবক শুভ্রবেশ অর্থাৎ পাজামা-পাঞ্জাবী কিংবা ধুতি-পাঞ্জাবী পরে থাকবেন। দুই বিভাগের ২০০ মণ্ডলেরও (অঞ্চল) বেশি থেকে যুবকেরা এই সমাবেশে যোগ দিয়েছেন। শাখার মুখ্য শিক্ষক থেকে প্রান্ত, ক্ষেত্র এবং বিবিধ সংগঠনের কার্যকর্তা মিলে প্রায় ১৫০০ কার্যকর্তা সমাবেশকে সফল করার জন্য কাজ করেছেন। প্রস্তুতিপর্বে শাখার, গ্রামের নাগরিক বৈঠক এবং যুবকদের ছোট ছোট গ্রুপের বৈঠক নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও কলেজ ছাত্রদের সঙ্গে সম্পর্ক তো রয়েছেই। সমস্ত কার্যকর্তার থাকার ও খাওয়ার ব্যবস্থা ছাড়াও যাতায়াতের ব্যবস্থাও স্থানীয় কার্যকর্তারা করেছেন।

গত ১২ জানুয়ারি থেকে ১৫০-এর বেশি জায়গায় শোভাযাত্রা হয়েছে। কোথাও সাইকেলে, কোথাও বা মোটর সাইকেলে। শুভ্রবেশে শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেছে সাড়ে ৯ হাজার যুবক। মালদা নগরের প্রচার প্রমুখ সুমন কর্মকার এবং ক্ষেত্রীয় সহ শারীরিক প্রমুখ বুদ্ধদেব মণ্ডল জানালেন— দুই বিভাগে মোট ৩০০ বেশি গাড়ির ব্যবস্থা হয়েছে স্থানীয় ব্যবস্থাপনায়। যাতে সমস্ত যুবকরা সহজে আসতে পারে। মালদা জেলার একটি খণ্ড আছে যার নাম হচ্ছে হবিবপুর। এই হবিবপুর খণ্ড থেকেই ২০০০ যুবক ৫০টি ভুটভুটি (তিন চাকার গাড়ি) করে থাকার ব্যবস্থা নিজেরাই করেছে।

দিনাজপুর বিভাগের প্রত্যন্ত গ্রামের স্বয়ংসেবক ও সাধারণ যুবকরা আসবে। তাদের জন্য ৬০০০ রুটির ব্যবস্থা করতে হবে। এই ৬০০০ রুটি এসেছে মালদা শহরের ১২০০ পরিবার থেকে। ২০০-র বেশি কার্যকর্তা বাড়ি বাড়ি সম্পর্ক, নিত্য যোগাযোগের মাধ্যমে এই ব্যবস্থা সফল করেই ছেড়েছে। বি এম এসের ৫০০-রও বেশি কার্যকর্তা বন্ধু এবং বিশেষ করে হকার্স বন্ধুরা সহযোগিতা করেছেন। সমীর রায় তার হার্ডওয়ারের দোকান ১৮০টি লোহার রড ব্যবহারের জন্য দিয়েছেন। সেইসব লোহার পাইপ দিয়ে বৃন্দাবনী ময়দানকে গেরুয়া পতাকা দিয়ে সুসজ্জিত করা হয়েছিল।

ভারতমাতার প্রতিকৃতি ও বিবেকানন্দের মূর্তি ও বাণীসহ ১০ ফুট চওড়া, ৮০ ফুট লম্বা আর ৪০ ফুট উচ্চতার একটি মঞ্চ বিবেকানন্দের মন্দিরের আদলে তৈরি করা হয়েছিল। মঞ্চ থেকে শেষ প্রান্তে (Gallery) দুই দিকে দুটি স্টল ছিল। একটি স্টলের মধ্যেই স্বস্তিকা ও বিবেকানন্দের সাহিত্য বিক্রির ব্যবস্থা ছিল। অপরটিতে কেবলমাত্র সঙ্ঘ ও স্বামীজীর বই এবং চিকিৎসা কেন্দ্র। ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। প্রকৃতি বিরূপ হওয়া সত্ত্বেও ৭০০০ যুবক স্বামী তত্ত্বজ্ঞানানন্দজীর (বেলুড় শিল্পমন্দিরের প্রিন্সিপ্যাল) ভাষণ, গৌড়ীয় মঠের বন্ধুগৌরব ব্রহ্মচারী মহারাজের আশীর্বচন এবং সব শেষে পূজনীয় সরসঙ্ঘচালকজীর বক্তব্য মনোযোগ সহকারে শোনে। ভবিষ্যৎ ভারত নির্মাণে যাদের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

৭৫ বছর ধরে সমাজসেবায় নিয়োজিত

আসবাব

বর্ধমান

(০৩৪২) ২৫৬৫৯৩১

ALWAYS EXCLUSIVE

Vandana™

SAREES

Cotton Printed Sarees

Contact - 22188744/1386

গহনা যদি গড়াতে চান
যে কোনও স্বর্ণকারকে

সুপার

ক্যাটলগ দেখাতে বলুন

সুরেন্দ্র চন্দ্র বসাক এণ্ড সন্স

১৫-ডি, গরাণহাটা স্ট্রীট, কলি-৬

ইচ্ছা থাকলেই উপায় হয়,
রোদ বৃষ্টিতে কিসের ভয়!

অক্ষয় কুমার পালের
ফোল্ডিং ছাতা

বড়বাজার,কলকাতা-৭০০ ০০৭,
ফোন ঃ ২২৪২৪১০৩

Steelam

EXCLUSIVE FURNITURE

স্টীলম এর ......
পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে
Exclusive Show Room
দেওয়া হইবে॥

Factory :- 9732562101

# চিঠিপত্র

## সংবাদপত্রে হিন্দুসমাজ

আমাদের দেশে কিছু সংবাদপত্রে প্রায়ই হিন্দু সমাজকে হেয় প্রতিপন্ন করতে খবর প্রচার করা হয়। যদিও সংখ্যাগুরু এখনও হিন্দু। কিন্তু হিন্দু সমাজের সমস্যা, আইনগত বৈষম্য (যেমন হিন্দু বিবাহ আইন, বিবাহের বয়সের আইন,) পুরোহিতদের ও হরিজনদের দারিদ্র্য— এ সমস্ত বিষয়ে লেখা খুব কমই চোখে পড়ে।

কিন্তু মাঝে মাঝেই প্রচার চলে সতীদাহ সম্বন্ধে। এর উদ্দেশ্য হিন্দু সমাজের প্রতি অশ্রদ্ধা তৈরির চেষ্টা। বেদে সতীদাহ নেই। সুতরাং ওই সতীদাহ কেন এবং কিভাবে প্রথম হিন্দু সমাজে এসেছিল সেকথা তো জানান হয় না। সতীদাহের উৎপত্তির সম্বন্ধে সকলেই নীরব। এমন কি রামমোহন রচনাবলীও এ বিষয়ে নীরব। রাজা রামমোহনই বা নীরব ছিলেন কেন এর উৎপত্তি সম্বন্ধে তা জানি না। আমরা দেখি বিদেশী আক্রমণকারীদের হাতে পাশবিক অত্যাচারের ভয়ে ভারতের নারীরা আগুনে মৃত্যুবরণ করত। ৭১২ খৃস্টাব্দের ঘটনা চাচা-নামা গ্রন্থে উল্লেখ আছে। মহঃ কাসিম বিশ্বাসঘাতক মোকাবিসয়ার দ্বারা নৌকা সরবরাহের ফলে তার সৈন্যবাহিনী সিন্ধুনদ পার হয়ে ব্রাহ্মণরাজা দাহিরের রাজ্য দখল করল, দাহিরের মস্তক কাটা হলো। দুর্গরক্ষার জন্য রাণী বাই যুদ্ধ করে যখন ব্যর্থ হলো তখন পাশবিক অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচতে আগুনে পুড়ে মৃত্যুবরণ করেছিল দুর্গের সমস্ত নারী। তাঁদের সংখ্যা পাঁচশত হতে পারে। এই ঘটনার উল্লেখ আছে আরবী ভাষায় লিখিত চাচা-নামা গ্রন্থের অনুবাদক ইলিয়ট ও ডাউসন সম্পাদিত গ্রন্থ History of India as Told by its Own Historians নামক গ্রন্থে। রাণীবাই দুর্গের সমস্ত নারীদের সমবেত করে বললেন, "God forbid that we should owe our liberty to these outcast cow-eaters! Our honour would be lost! Our respite is at an end, and there is no where any hope of escape; let us collect wood, cotton, and oil, for I think that we should burn ourselves and go to meet our husbands. If any wish to save herself she may.' So they went into a house, set it on fire, and burnt themselves." (Elliot and Dadson, History, Vol. 1, p. 172)। কয়েক বছর আগে আমি রাজস্থানের ঝুনঝুনে সতী মন্দির দেখতে গিয়েছিলাম। বিরাট মন্দির, এক দর্শনীয় মন্দির। বিদেশীদের, বিদেশী আক্রমণকারীদের পাশবিক অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তি পেতে বহুনারী আগুনে মৃত্যুবরণ করেন। সেই স্মৃতিই বহন করছে ঝুনঝুনের ঐতিহাসিক সতীমন্দির।

**—কৃষ্ণকান্ত সরকার, দমদম, কলকাতা।**

## মোদী হঠাও অভিযান

স্বাধীন ভারতে বহু রাজ্যেই বহুবার দাঙ্গা হয়েছে। ভারতবর্ষে বেশিরভাগ সময় কংগ্রেস সরকার ছিল। সুতরাং গুজরাটের দাঙ্গার জন্য মোদীকে দোষ দেওয়া হচ্ছে কেন? উনি দাঙ্গাতে প্ররোচনা দিয়ে গেছেন বলে অনেকে যুক্তি দেখাচ্ছেন। এই নিয়ে তো বহু কমিশন বা বিচার হয়েছে। কেউ কি প্রমাণ করতে পেরেছেন উনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দাঙ্গায় ইন্ধন জুগিয়েছেন।

২০০২ সালের পরে গুজরাটে আর কোনও দাঙ্গা ঘটেনি, যদিও কংগ্রেসী জামানায় বা ২০০২ সালের আগে হামেশাই কাগজে পড়তাম গুজরাট, বরদায়, আমেদাবাদের দাঙ্গার কথা। সুতরাং দাঙ্গা না হওয়াটাই মোদীর বিশেষ কৃতিত্ব। লোকে বলে ওখানকার মুসলমানরা নাকি ভয়ে সিঁটিয়ে থাকে, দাঙ্গা করার সাহস পায় না। তাই যদি হয় তো ভালকথা। হিন্দুরাও দাঙ্গা করছে না। এটা তো একটা সুখবর। হিন্দু, মুসলমান শান্তিতে বসবাস করছে। মুসলমানরা নাকি ওখানে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসাবে দিনযাপন করছে। তার বিরুদ্ধ যুক্তি হচ্ছে কুতুবুদ্দিন আনসারি, যে ব্যক্তিটি দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে কলকাতায় সেলিম সাহেবের কাছে আশ্রয় নিয়েছিলেন তিনি আবার গুজরাটে ফিরে গেছেন এবং তিনি ওখানে সুখেই আছেন। ওখানকার মুসলিম এলাকাতেই মোদীর দল জয়লাভ করেছেন এবং ওখানে রিগিং বা জালিয়াতি করে ভোট করানো হয়েছে বলে কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

আসল কথা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ দল বা নেতাদের গাত্রদাহ হলো যে মোদীর কার্যকলাপে তাঁদের মুসলিম ভোট ব্যাঙ্ক নষ্ট হয়ে যাবে। মোদী প্রধানমন্ত্রী হলে তাঁদের সুখের রাজত্ব শেষ হয়ে যাবে। যেভাবে মুসলিম ভোট, তপশীলি জাতি, উপজাতি ইদানিংকালে অনগ্রসর শ্রেণীর ভোট ব্যাঙ্ক সংরক্ষিত করে ক্ষমতা দখল করছেন তা আর হবে না। ভুলে যাবেন না মোদীও একজন অনগ্রসর শ্রেণীভুক্ত।

**—কমল মুখার্জী, ধরমপুর, চুঁচুড়া, হুগলী।**

## প্রসঙ্গ—স্বস্তিকা

অভিবাদন স্বস্তিকা বিবেকানন্দ জন্মসার্ধশতবর্ষ সংখ্যার জন্য। নামী-দামীরা লিখেছেন। স্বস্তিকা'র প্রতি সংখ্যা সময় উপযোগী। ভাষা বলিষ্ঠ, প্রাঞ্জল, স্পষ্ট কথা, স্পষ্ট ভাষায় জানাতে দ্বিধা করে না। বহুকাল থেকে পাঠ করে আসছি। স্বল্প মূল্যের অমূল্য পত্রিকা। সবার ঘরে, সবার প্রাণের সঙ্গে যুক্ত নাম। নবাঙ্কুর চমৎকার বিভাগ, প্রতি সংখ্যায় ছড়া থাকুক চাই। কবিতা, গল্প চাই, প্রতিটি সংখ্যায়। আমার প্রিয়-পত্রিকা প্রতি সংখ্যা পাঠ করি। সম্পদসম রক্ষা করি। ৬৫ বছর ধরে চলছে, কম কথা নয়, কপালে এঁকে দিলাম জয়ের টিকা। প্রিয় পত্রিকা স্বস্তিকা।

**—অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়, এসিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা।**

ফঃ ৩

# গঠনমূলক ছাত্র-রাজনীতি শুরু হোক

**শ্যামল কুমার হাতি**

১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ একটা 'কালো দিন' হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। কলকাতায় গার্ডেনরিচ এলাকায় ছাত্রসংসদ নির্বাচন উপলক্ষ করে এক কর্তব্যরত পুলিশকর্মীর প্রকাশ্য রাজপথে গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হলো। না, আর ভাবা যায় না। এরপর সাধারণ মানুষ কোথায় যাবে? কার কাছে বিপদে পড়লে ছুটে যাবে বলতে পারেন? এমন কাণ্ড যদি গুজরাটে হোত, যদি আততায়ী এবং নিহতের ধর্মবিশ্বাস আলাদা হোত তা হলে তো সারা দেশের বুদ্ধিজীবীরা নানারকম কথা বলতেন। দিল্লীর যন্তরমন্তরের সামনে লালু-মুলায়ম-মায়াবতীদের নিয়ে অনশনে বসে যেতেন। কি বসতেন না? মনে নেই দিল্লীর একটি ঘটনার পর বাংলার নেত্রী অমর সিং-এর সঙ্গে ধর্না দেননি? এখন সব চুপচাপ কেন? এই রাজনীতিই দিনে দিনে যুব শক্তিকে বিপথগামী করেছে। আমার দলের লোক যুক্ত থাকলে তাকে বাঁচাব আর অন্যকে ফাঁসাব এভাবে চললে ভবিষ্যৎ কাউকে ছাড়বে না। মনে রাখতে হবে বাংলায় একটা কথা আছে 'ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে।' কাল কাউকে ক্ষমা করবে না।

আমরাও ছাত্ররাজনীতি করেছি। ১৯৬৮ সাল থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত সক্রিয়। তখন সারা রাজ্যে নকশালপন্থী ছাত্র রাজনীতির জোর ছিল। আমরা অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ করতাম। তখন ছাত্র পরিষদ। ছিল বি পি এস এস (বর্তমানে ওরা এস এফ আই), সারা ভারত ছাত্র ব্লক ছিল। আর ভবানীপুরে ছিল ডি এস ও। বাংলায় তখন কলেজগুলিতে বিদ্যার্থী পরিষদ এবং ছাত্র পরিষদের শক্তি সমান সমান ছিল। তবুও বলছি তখন কিন্তু এমন যুদ্ধ

যুদ্ধ ভাব ছিল না। তবে খুঁজতে হবে আজ এই অবস্থা এল কীভাবে? শুরু হয়েছিল সিদ্ধার্থ রায়ের হাত ধরে। যে প্রিয়রঞ্জন এবং সুব্রত মুখার্জীরা বিদ্যার্থী পরিষদের তৎকালীন রাজ্যদপ্তরে ২০৩/১ বিধান সরণীতে জাতীয়তাবাদীদের একযোগে লড়তে হবে বলার জন্য এসেছিলেন, তাঁরাই সিদ্ধার্থ রায়ের কৃপায় বাঘে পরিণত হয়েছিলেন। তখন যুবকংগ্রেস-ছাত্র পরিষদ একত্রে কলেজগুলি দখল করে রেখেছিল। পরে অর্থাৎ ১৯৭৭-এরপর জ্যোতি বসুর হাত ধরে বাংলার কলেজে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঘ হয়ে ফিরে এল এস এফ আই। টানা ৩৪ বছর কলেজগুলিতে নির্বাচন হতে দেয়নি। আজ যে ভাবে যে কায়দায় তৃণমূলের ছেলেরা রাজ্যের কলেজগুলিতে ছাত্র-সংসদ নির্বাচন করছে। এখন এখানে সব কিছুই গাজোয়ারি করেই চলছে। শুধু প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে সবকিছু চলছে। তাই তো রাইটার্সে যে দল রয়েছে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়েও সেই দলের লোকজন রয়েছেন। যে কায়দায় আগের দলের লোকেরা চলত সেই একই কায়দায় পরিবর্তনের সরকারের লোকেরা চলতে লাগল। অথচ আমাদের পাশের রাজ্য— বিহার, ওড়িশায় তো এমনটা হয় না। সরকারে কংগ্রেস থেকেছে, কখনও লালু, নবীন পট্টনায়করা থেকেছেন, এখন বিহারে নীতিশ কুমার আছে। ওখানে কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮০ শতাংশ স্থানে এ বি ভি পি আছে আর বাকি আছে এন এস ইউ। তাঁরা কংগ্রেসের ছাত্র সংগঠন। কলকারখানায় আছে বি এম এস এবং আই এন টি ইউ সি। তারা তো সরকার বদল হলে কলেজ থেকে কারখানায় আদর্শের রং বদলায় না। ভারতের অন্য অঙ্গ রাজ্যের চিত্রটাও তাই। আমাদের দেখে সারা ভারতের লোকেরা হাসে। শুধু তাই নয় উন্নয়নের প্রশ্নে দেশের অন্যসব রাজ্যের বিভিন্ন দলের সাংসদরা একত্রে কথা বলেন। আর আমরা? সেখানেও আমরা একে অন্যের সমালোচনা করি। এর থেকে আমাদের শীঘ্রই বেরিয়ে আসতে হবে। তা না হলে বাংলার সমূহ বিপদ। কচি কচি ছেলেমেয়েরা আমাদের ভবিষ্যৎ। তাদের মানুষ হওয়ার শিক্ষা দিন। তাদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে মানুষ খুন করাবেন না। ৬ মাস কলেজে নির্বাচন বন্ধ করে এ সমস্যার সমাধান হবে না। ছেলেদের দিয়ে 'ক্রিয়েটিভ' কাজ করানো হোক। এ ভাবনা মুখ্যমন্ত্রী এবং শিক্ষা মন্ত্রীর আসা দরকার। তবেই বাংলা তথা দেশের উন্নতি হবে।

পরম্পরা

# মনীষীদের দৃষ্টিতে প্রার্থনা

ধর্মজগতে প্রার্থনার গুরুত্ব অসীম। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় প্রার্থনা কাকে বলে? কেমন ভাবে করতে হয়? বা আমাদের প্রার্থনা কেন ফলপ্রসূ হয় না তা জানি না। এই সমস্ত অজ্ঞতা দূরীকরণে সাধক-সাধিকাদের নির্দেশাবলী আমাদের পথ দেখায়।

(১) ঠাকুরের কাছে মনের কথা জানিয়ে প্রার্থনা করবে। প্রাণের কথা কেঁদে বলবে— দেখবে তিনি একেবারে কোলে বসিয়ে দেবেন।

—শ্রীশ্রীমা সারদা দেবী।

(২) যখনই নিজেকে দুর্বল মনে কর, প্রার্থনা করিও, ফল দেখিতে না পাইলেও বিশ্বাস ও প্রার্থনা পরিত্যাগ করিও না। তোমার অজ্ঞাতসারেও অনেক সুফল ফলিতে পারে।

—স্বামী পূর্ণানন্দ (হৃষীকেশ)

(৩) রাত-দিন তার কাছে প্রার্থনা যেন উদ্দেশ্য না ভুল হয়ে যায়।... এই যে হোমাদি করে, মন্ত্র পাঠ করে বহিঃ সন্ন্যাস-ও দরকার। ওই তো আরম্ভ। বাহিরের struggle শেষ ওখানে। অন্তরের struggle হচ্ছে মনকে অন্তর্মুখী করানো। সর্বদা প্রার্থনা করো।

—শ্রীমা।

(৪) শ্রী ভগবানের নিকট তোমার আন্তরিক ইচ্ছা জানাইবে, তিনি বাঞ্ছাকল্পতরু। মন ও মুখ এক করিয়া ব্যাকুলতার সহিত প্রার্থনা করিলে তিনি তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করিবেন এবং তোমার সমস্ত বাধা-বিঘ্ন দূর করিয়া দিবেন।”

—স্বামী অভেদানন্দ।

(৫) প্রার্থনা কায়মনোবাক্যে করিতে হয়। যদি মন না থাকে তবে উচ্চস্বরে প্রার্থনা আসিবে কোথা হইতে? তবে জানিও যদি ঠিক ঠিক ভাবে মন দিয়ে প্রার্থনা করা যায়, তবে দেহ ও বাক্য আপনা আপনি আসিয়া মিলিত হইবে।”

—শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী।

(৬) প্রার্থনা হচ্ছে অন্তর্যামীর কাছে অন্তরের বেদনা ও অভাব ভাবে বা ভাষায় জানানো ও তা থেকে মুক্ত করবার জন্য কাতর ভাবে তার করুণা ভিক্ষা করা।... আমরা প্রার্থনা করি মুখে, অন্তর থেকে

নয়, তাই কোনও ফল হয় না, অন্তর থেকে হলে ফলবেই।

—স্বামী বিরজানন্দ (রামকৃষ্ণ মঠ)

(৭) আমার কাছে প্রার্থনা করলে অর্থাৎ মানুষ গুরুর কাছে প্রার্থনা করলে ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান সকলকেই পাওয়া যায়। এই মানুষ গুরুর সবই দেবার ক্ষমতা আছে। শুধু গুরু জীবন্মুক্ত ব্রহ্মজ্ঞানী, আত্মদর্শী এই বিশ্বাসটুকু থাকলেই হলো। ... আর ঠিক ঠিক গুরু শিষ্য হলে কেউ কাউকে ছেড়ে থাকতে পারে না। শিষ্যের আকুল ক্রন্দন আর প্রার্থনায় গুরু না এসে থাকতে পারে না।

—ঠাকুর শ্রীশ্রী নিগমানন্দ।

(৮) “...নিন্দা, গালি, শপথ এই তিনটি যখনই করা হয় তখনই প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ এক হাজার হরিনাম জপ করা ও প্রার্থনা কর— ‘হে ভগবান, আর যেন এইরূপ বাক্য মুখের বাহির না হয়”।

—স্বামী ভোলানন্দ গিরি।

(৯) ঈশ্বরের কৃপা চাই। তার কৃপা না হলে কিছুই হয় না। কৃপার জন্য দিন রাত তার নিকট প্রার্থনা করতে হয়। প্রার্থনায় খুব কাজ হয়। তিনি বড় শোনেন।”

—স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

(১০) প্রার্থনা বচন বিন্যাস নহে, মনের ভাবও নহে, কোনওরূপ প্রক্রিয়াও নহে। প্রার্থনা আত্মার একটি স্বভাব। যদি মানুষ নিজের আত্মার একটি বা অনেক প্রকার অভাব অনুভব করে, পরে সেই অভাব মোচনের জন্য তাহার প্রাণে নিতান্ত ব্যাকুলতা জন্মে। তখন পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াও সে যদি দেখে ওই অভাব দূর করিবার তাহার নিজের তিলমাত্র ক্ষমতা নেই, অপর কোন সর্বশক্তিমান ও করুণাময় পুরুষের সেই শক্তি আছে, তখন তাহার আত্মার যে অবস্থা হয় সেই অবস্থার নাম প্রার্থনা অবস্থা।

—আচার্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

আপনি আচরি ধর্ম :

(১১) “ব্রাহ্মদের উপাসনা প্রণালীতে অল্পদিনের মধ্যে আমি অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়া পড়িলাম। প্রতিদিন দু’বেলা নিয়মিত রূপে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। প্রার্থনা করিয়া যেদিন না কাঁদিতাম, উপাসনা হইল না ভাবিয়া সারাদিন উদ্বেগে কাটাইতাম।

—ব্রহ্মচারী কুলদানন্দ।

**তথ্যসূচী :** (শুধু প্রার্থনার ক্ষেত্রে)

(১) শ্রীমায়ের উপদেশ— ১৫ (২) বেদ-বাণী— ২৭১ (৩) নিবোধত পত্রিকা— ১৪ শ বর্ষ (৪র্থ) (৪) অভেদানন্দের উপদেশ— ৪৩ (৫) ধ্যান, জপ, প্রার্থনা— ৭৮ (৬) পরমার্থ প্রসঙ্গ— ৪৩ ও ৯ (৭) অভয়বাণী— ৩১-৩২ (৮) মহাপুরুষ বাণী— ৩১ (৯) ধর্মপ্রসঙ্গে— ১৪৭ (১০) উপদেশ সংগ্রহ— ৩২।

***সংকলক : নীলমণি চক্রবর্তী***

# হুগলি জেলার কেষ্টপুরে উত্তরায়ণের মেলা

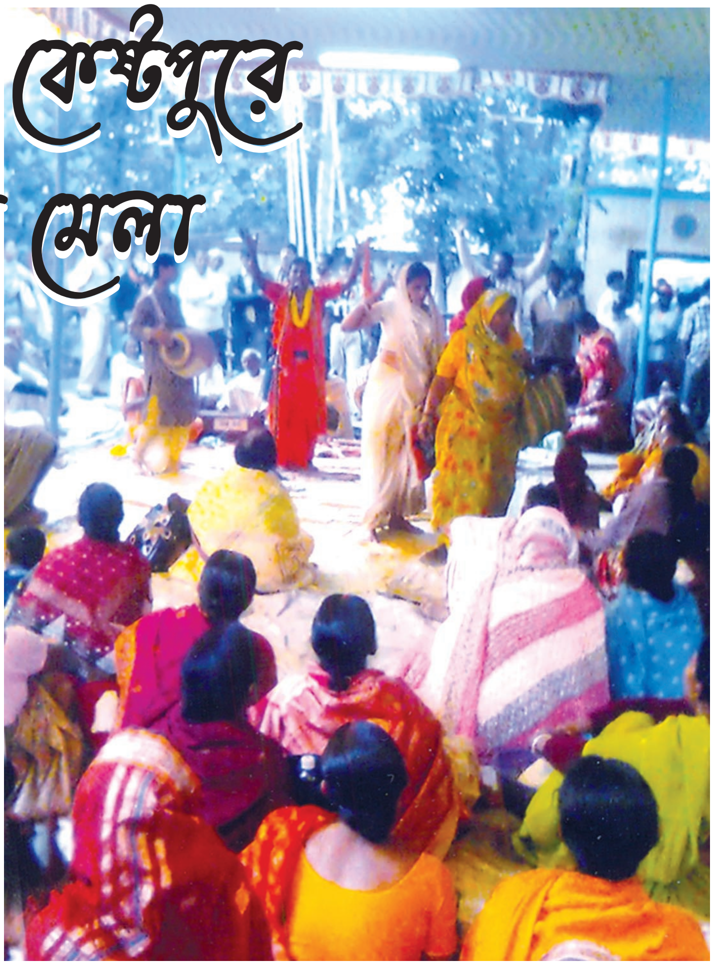

**উজ্জ্বল কুমার মণ্ডল**

হুগলি জেলার ব্যান্ডেলের কাছে সপ্তগ্রাম বা আদিসপ্তগ্রাম। প্রাচীন বাংলার ব্যস্ত বাণিজ্যকেন্দ্র। আসলে পরস্পর সন্নিহিত সাতটি গ্রাম— খামারপাড়া, বংশবাটি, শিবপুর, বাসুদেবপুর, ত্রিশ বিঘা, কৃষ্ণপুর, দেবানন্দপুর। এদের মধ্যে কৃষ্ণপুর ব্যান্ডেল থেকে তিন কিলোমিটার পশ্চিমে অবস্থিত। গ্রামের পশ্চিমে ক্ষীণস্রোতা, প্রায় মজে যাওয়া ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সরস্বতী নদী।

ষোড়শ শতাব্দে কৃষ্ণপুরে বা অপভ্রংশে কেষ্টপুরে জমিদার ছিলেন গোবিন্দদাস মজুমদার। তার ছেলে রঘুনাথ দাস। জমিদার তনয়, কিন্তু কী যে তাঁর দুঃখ, বাল্যকাল থেকে ভোগসুখে উদাসীন। 'বাল্যকাল হৈতে তেঁহো বিষয়ে উদাস।'

১৪৮৬ সালে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করে নীলাচলে অবস্থান করছেন। নীলাচলে মহাপ্রভুর কাছে যাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েন রঘুনাথ দাস। একবার সন্ন্যাস নেবার সংকল্প নিয়ে গৃহত্যাগও করেন। কিন্তু 'দূর হৈতে পিতা তারে আনিল ধরিয়া'। শুধু একবারই নয়,

বার বার পালায় তেঁহো নীলাদ্রি যাইতে।
পিতা তারে বান্ধি রাখে আনি কাথ হৈতে।।

এইভাবে কয়েকবার গৃহত্যাগ করেন আর ধরা পড়ে ফিরে আসতে বাধ্য হন।

শ্রীচৈতন্যদেব তখন বৃন্দাবন যাওয়ার পথে নীলাচল থেকে বাংলায় শান্তিপুরে অদ্বৈতভবনে আশ্রয় নিয়েছেন। অন্যান্য ভক্তের সঙ্গে রঘুনাথ দাসও মহাপ্রভুকে দর্শন করেন। রঘুনাথ দাসের মন বুঝে শ্রীচৈতন্য উপদেশের ছলে তাঁকে বলেন :

স্থির হৈয়া ঘরে যাও না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোকে ভবসিন্ধুকুল।।
মর্কটবৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হৈয়া।।
অন্তরে নিষ্ঠা কর বাহ্যে লোক ব্যবহার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার।।

লোকচরিত্রজ্ঞ মহাপ্রভু বুঝেছিলেন, নবীন যুবক রঘুনাথের হৃদয়ে প্রবল প্লাবনের বেগে কৃষ্ণপ্রেমের আবির্ভাব হয়েছে, কিন্তু তখনও পরিপক্ব ভক্তি জাগ্রত হয়নি, তাই এই উপদেশ।

রঘুনাথ বাড়ি ফিরে মহাপ্রভুর নির্দেশে যথারীতি কাজকর্ম করতে লাগলেন। একদিন শুনলেন, পানিহাটিতে প্রভু নিত্যানন্দ হাজির হয়েছেন। রঘুনাথ চুপিসারে সেখানে উপস্থিত হলে নিত্যানন্দ বললেন :

*চোরা দিলি দরশন*
*আয় আয় আজ তোর করিব দণ্ডন।।*

প্রভুপাদ নিত্যানন্দ বললেন, তোমাকে দণ্ড দেব। তুমি এই সমস্ত বিভিন্ন জাতির ভক্তদের চিঁড়াদধি ভোজন করাও। রঘুনাথ সানন্দে এই দণ্ড গ্রহণ করে বহু অর্থ ব্যয় করে গঙ্গার তীরে ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণ ভক্তদের চিঁড়াদধির 'ভাণ্ডারা' লাগিয়ে দিলেন।

রথযাত্রার পূর্বে গৌড়ীয় ভক্তগণ শিবানন্দ সেনের নেতৃত্বে শ্রীক্ষেত্রে মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হতে চলেছেন। রঘুনাথ এঁদের সঙ্গ ধরলেন না। বাবা খবর পেলে আবার তো ধরে আনবেন। তখন রঘুনাথ কৌশলে, সবার দৃষ্টির আড়ালে অজ্ঞাত, অনভ্যস্ত ও বিপজ্জনক পথে প্রায় অভুক্ত থেকে শীর্ণ শরীরে মহাপ্রভুর পদতলে উপস্থিত হলেন। শ্রীচৈতন্য এবার তাঁকে ফিরিয়ে দিলেন না, বরং তরুণ ভক্তকে দেখে পরম প্রীত হলেন। তিনি স্বরূপ দামোদরের হাতে

রঘুনাথের সাধনা ও শিক্ষার ভার দিলেন :

এই রঘুনাথে আমি সঁপিলু তোমারে।
পুত্র ভৃত্য রূপে তুমি কর অঙ্গীকারে।।

সেই থেকে তিনি হলেন 'স্বরূপের রঘু'। স্বরূপ দামোদরের তিরোধানের পর রঘুনাথ দাস বৃন্দাবন চলে যান। বৃন্দাবনের যে ছ'জন গোস্বামী গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম ও সমাজে ষড় গোস্বামী নামে পরিচিত, শ্রদ্ধেয় রঘুনাথ দাস তাঁদের অন্যতম।

রঘুনাথ দাস আর বাংলায় ফেরেননি, কিন্তু বাংলার মানুষ তাঁকে ভোলেনি। তাঁর জন্মভিটা তাই ভক্তজনের কাছে শ্রীপাট। প্রতি বছর ১ মাঘ তাঁর স্মৃতিতে একদিনের মেলা বসে। শ্রীপাটকে কেন্দ্র করে এই উৎসব। একে উত্তরায়ণের মেলাও বলে।

যাওয়া যাক, সেই মেলার আসরে। একদিনের মেলা বলে অবহেলার বিষয় নয়, জনসমাবেশ উল্লেখযোগ্য। শ্রীপাটে রঘুনাথ দাসের বাবার প্রতিষ্ঠিত রাধাগোবিন্দ, রঘুনাথ দাসের ভজন কুটির, গোস্বামী মহাশয়ের ব্যবহৃত খড়ম পূজা পেয়ে আসছে। যাত্রীরা রাধাগোবিন্দের উদ্দেশে, রঘুনাথ দাসের ভজন কুটিরে প্রণত হচ্ছেন। বর্তমান সেবায়েত বাবাজীকে প্রণাম জানাচ্ছেন।

সকাল থেকে বসেছে রাধাকৃষ্ণের লীলাকীর্তনের আসর। তার বিরাম নেই। দুপুর থেকে উপচে পড়ছে ভিড়। লোকারণ্য। ব্যান্ডেল এবং আদি সপ্তগ্রাম দুটি রেল স্টেশন থেকে শ্রীপাটে আসা যায়। দুটি রাস্তাতেই জনস্রোত। মন্দিরের সামনের প্রাঙ্গণ অপ্রশস্ত। রাস্তাতেই বসেছে হরেক মালের ব্যাপারীরা। সবই আছে। মণিহারী, কাঠের, লোহার জিনিসপত্র, বাসনকোসন, খেলনা, চুড়ি, ফাস্টফুড, গজা, খাজা, জিলিপি, পাপড়, সস্তার সিডি, ডিভিডি-র ক্যাসেট, বোম্বের হিরো- হিরোইনদের ছবি। চাউমিন এগরোল খাচ্ছে হুড় হুড় করে। ঘুরছে নাগরদোলা। কীর্তনের আসরে শ্রোতাগণ মাঝে মাঝে উলুধ্বনি দিচ্ছেন। ধ্বনিত হচ্ছে শ্রীগুরু প্রেমানন্দে নিতাই গৌর হরিহরি বোল ধ্বনি। বাজছে শ্রীখোল, কীর্তনিয়া গাইছেন আর কাঁদছেন :

না পোড়াও রাধা অঙ্গ, না ভাসাইও জলে।...

কিন্তু এ মেলার কি মুখ্য আকর্ষণ মাছের দোকান? যা, মন্দিরের পেছনে সরস্বতী নদীর তীরে বসেছে, তা প্রায় চল্লিশটি দোকান। মেলা উপলক্ষেই তাদের আসা, মিঠা জলের মাছ যেমন আছে সামুদ্রিক মাছও আছে। তুলনায় সামুদ্রিক মাছই বেশি। এক একটি মাছ দানবাকৃতি। সবচেয়ে ভিড় এই মাছের দোকানে। পা রাখার জায়গা নেই, ধাক্কাধাক্কিও হচ্ছে। বিকোচ্ছেও ভাল।

আর এই জন্য কেষ্টপুরের মেলার চলতি নাম 'মাছের মেলা', আসলে বৈষ্ণব শিরোমণি শ্রীল রঘুনাথ দাসের স্মরণ উৎসব। সম্পূর্ণ সাত্ত্বিক ব্যাপার। সাধু, গুরু, বৈষ্ণবের বিচরণ ক্ষেত্র। কিন্তু অত্যাশ্চর্য, বাঙালির কাছে তা 'মাছের মেলায়' পরিণত হয়েছে। বাঙালির মৎস্য প্রীতির এও বোধ হয় এক অনন্য দৃষ্টান্ত।

*উদ্ধৃতি : চৈতন্যচরিতামৃত : কৃষ্ণদাস কবিরাজ।*


ভ্রমণ পিপাসু বাঙালীর নির্ভরযোগ্য সঙ্গী

Sharada Travels

শারদা ট্রাভেলস্

ফুলেশ্বর, উলুবেড়িয়া, হাওড়া

প্রত্যুষ মণ্ডল — 9874398337

গ্রীষ্মকালীন ভ্রমনসূচী-২০১৩

| ভ্রমণ | দিন | শুভ যাত্রা | প্যাকেজ মূল্য প্রাপ্তবয়স্ক | বালক/বালিকা ৫-১১ বৎসর | শিশু ২-৪ বৎসর |
|---|---|---|---|---|---|
| উত্তর ভারত (দেরাদুন-মুসৌরী-হরিদ্বার-দিল্লি-মথুরা-বৃন্দাবন-আগ্রা) | ১২ | ১৫ই মার্চ,২০১৩ | ৯,৮০০/- | ৭,৫০০/- | ২,৫০০/- |
| কাশ্মীর (অমৃতসর ও বৈষ্ণোদেবী সহ) | ১২ | ২৮শে মার্চ,২০১৩ | ৯,৮০০/- | ৭,৫০০/- | ২,৫০০/- |
| গ্যাংটক-নামচি-পেলিং | ৮ | ১৭ই এপ্রিল,২০১৩ ২২শে মে,২০১৩ | ৭,০০০/- | ৫,৫০০/- | ২,০০০/- |
| দার্জিলিং-গ্যাংটক | ৮ | ২৩শে মে,২০১৩ | ৬,৮০০/- | ৫,১০০/- | ১,৭০০/- |
| সিমলা-কুলু-মানালী | ১১ | ৯ই মে,২০১৩ | ৯,৫০০/- | ৭,৩০০/- | ২,৪০০/- |

ট্রেনের টিকিট নিশ্চিত করতে অবশ্যই যাত্রা শুরুর চার মাস আগে যোগাযোগ করুন অথবা ডাকুন।

**প্যাকেজে থাকছে :-** ট্রেন/লাক্সারী বাস/ছোট গাড়ীতে যাতায়াত, সাইড সিইং, সকালে চা টিফিন, লাঞ্চ, ডিনার (আমিষ/নিরামিষ), টোল ট্যাক্স,গাড়ী পার্কিং।

**প্যাকেজে থাকছে না :-** এন্ট্রি ফি, কুলী ভাড়া, ক্যামেরা চার্জ, নৌকাবিহার, রোপওয়ে, হাতি/ঘোড়া চাপা, পূজো দেওয়া, ব্যক্তিগত ব্যবহারের গাড়ি ভাড়া।

স্কুল, কলেজ ও গ্রুপ টুরের জন্য যোগাযোগ করুন।

# হোতু-কোতু উপাখ্যান

নবাঙ্কুর

# হেডস্যারকে হোতু ভোলেনি

হোতু কোনও সময়েই ভোলেনি হেডস্যারের কথাটা। ছাত্রদের পড়াশোনা ছাড়া অন্য কাজ নেই। যারা তাদের অন্যদিকে নিয়ে যেতে চায় তাদের ভালো চোখে দেখতেন না কৃষ্ণসাধন দত্ত। স্পষ্ট ভাষায় বলতেন, 'ছাত্রদের ভালোমন্দ নিয়ে কথা বলতে চাইলে শুনবো। কিন্তু রাজনীতির প্যাঁচে জড়াতে চাইলে সৌজন্য বজায় রেখে বলবো, আসুন।' কোনও নেতাগোছের কেউ হুমকি-টুমকি দিলে মুখ বুজে মেনে নিতেন না। স্কুলে কোনও দল ধর্মঘট করাতে এলে তিনি নিজে গেটের সামনে দাঁড়িয়ে বাধা দিতেন। গেটে

তালা দেওয়া হোত। অনেক সময়েই বন্ধ করতে আসা ছেলের দল খারাপ ব্যবহার করত। তিনি বলতেন, 'বাবা মায়েরা তোমাদের কষ্ট করে পড়াচ্ছেন। তাঁরা কি জানেন তোমরা পড়ার নাম করে রাজনীতিওয়ালাদের সঙ্গে নাচানাচি করছো?' তাঁর কৌশল ছিল, কথাবার্তা চালিয়ে ধর্মঘটীদের আটকে রাখা কিছুক্ষণ। সিদ্ধান্ত আগেই নেওয়া হোত, স্কুল খোলা থাকবে। বাইরে থেকে বাধা এলে ছুটি দেওয়া হবে কিছুক্ষণ ক্লাস করিয়ে। পিছনের গেট দিয়ে স্কুলের ছাত্রদের বের করে বলা হোত, 'সোজা বাড়ি যাবে। ধর্মঘটী পড়া-বন্ধ করিয়েদের দলে ভিড়বে না। আর তা করলে পরের দিন স্কুলে ঢুকবে না।' সেই কড়া নীতির কথা ভোলেনি হোতু। হেড-স্যারের কড়াকড়ি ছিল বলেই অনেকে জীবনে মানুষ হতে পেরেছে। বড়ো হওয়া আর মানুষ হওয়া— এক জিনিস নয়। সব জীবই প্রাকৃতিক নিয়মে বড়ো হয়ে যায়। মানুষ হওয়া খুব কঠিন ব্যাপার। হেড-স্যার বলতেন, 'রাজনীতি করতে পারো বড়ো হয়ে। এখন সময় হয়নি।'

এখন ছাত্রদের নিয়ে যে রকম রাজনীতি চলেছে তা একেবারেই সমর্থন করেননি হেডস্যার। দিনে দিনে রাজনীতির ভাবভঙ্গি দেখে মন খারাপ হয়েছে ওঁর। বড় একা হয়ে গিয়েছিলেন। তবে আশপাশের লোকজন বলত, 'স্যার যা করবেন ভাবেন তাই-ই করেন।' দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন— এই সচেতন নীতি বজায় রেখেছেন বরাবর। রাজনীতিওয়ালারা সকলে তো সমান নয়। কেউ কেউ সৌজন্য বজায় রেখে কথা বলতে জানেন। আবার কেউ কেউ বড় কঠিন, সবসময় তিরিক্ষি মেজাজের। স্যার জানতেন অত কড়া নীতি বজায় রাখা যাবে না। বলতেন, 'রাজনীতিওয়ালারা সব জায়গায় ঢুকে পড়বেই। তাতে মস্ত ক্ষতি হয়ে যাবে। আজকের ছেলেমেয়েরাই বড়ো হবে। তারা খুব চটপট বড়ো হয়ে ওঠে। তাদের এগিয়ে যাওয়ার পথ করে দেওয়ার দায়িত্ব সকলের। শরীরে মনে বড়ো হয়ে উঠবে, গড়ে তুলবে নিজেদের। তাদের সামনে ভালো কাজ, সুনীতি, আদর্শ তুলে ধরা দরকার। খুব কঠিন হলেও সে দায়িত্ব নিতে হবে প্রত্যেককে। আগামী দিনের স্বার্থে। সত্যিকারের ছাত্রকল্যাণ তাতে। নেতারা ভাবে ছাত্রদের দলে টানতে পারলে নিজেদের স্বার্থ গোছানো যাবে।' হেড-স্যারকে অনেকেই বলতেন, 'আদর্শ মানুষ গড়ার কারিগর।' ভোর চারটেয় তাঁর দিন শুরু হোত। সারাদিনের কাজ কি কি তা লিখে রাখতেন আগের দিন। তার মধ্যে কোনও জরুরি কাজ এলে সারতেন। কখনও বিরক্ত হতেন না। ছাত্ররা সবসময় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারত। তাদের সব কথা মন দিয়ে শুনতেন। অনেকের সমস্যা থাকত, হেডস্যারকে জানাতে ভয় পেত। তিনি অন্য শিক্ষকদের বলতেন, 'প্রত্যেকের দিকে লক্ষ্য রাখবেন।' হেড-স্যার প্রত্যেকটি ছাত্রের নাম মনে রাখতেন।

হেডস্যার স্কুলে ধুতি পাঞ্জাবি পরতেন। যখন কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছেন তখন পরতেন প্যান্ট-শার্ট। বেড়াতে যেতেন বছরে দুবার। পুজোর ছুটি আর গরমের ছুটিতে। সে সময় প্যান্ট পরতেন। ছবি তুলতেন। ব্যাগে সবসময় রাখতেন 'গীতবিতান।' বেড়িয়ে ফেরার পর লিখে ফেলতেন। ছবি সমেত ছাপা হোত কোনও- না-কোনও ভ্রমণের পত্রিকায়। অবসর নেওয়ার পর যোগ দিয়েছিলেন এক ছোটোদের সংস্থায়। কোনও পারিশ্রমিক বা সম্মান-দক্ষিণা নিতেন না। বরং ছোটোদের জন্যে নিজের সঞ্চয় থেকে কিছু খরচ করতেন। কারও প্রণাম নিতেন না। ছোটোদের বলতেন, 'লড়ো-পড়ো-গড়ো, এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো।'

হোতু কোনও সময়েই ভুলতে পারেনি হেডস্যারের বিভিন্ন উপদেশ। তিনি বলতেন, 'পরামর্শ।' ছোটোদের সম্মান জানাতেন সবসময়। ছোটোদের সংস্থার বড়োরা কেউ কেউ তাঁকে 'স্যার' বললেও ছোটোদের কাছে ছিলেন 'দাদু।' ছোটোদের জন্যে ছিল তাঁর অফুরন্ত স্নেহ। তারা ছিল তাঁর বন্ধু।

হোতুর প্রায়ই মনে পড়ে স্যারের কথা। ওইরকম আর কোনও মানুষের সঙ্গে এখনও দেখা হয়নি তার।

**কৌশিক গুহ**

***ছবি : রমাপ্রসাদ দত্ত***

## বই কথা কই

# রিয়াকে বই পড়ায় উৎসাহ দেয় দাদাই

রিয়ার দাদুর ঘরের আলমারির কাঁচের উপরে একটা কাগজের টুকরো সাঁটা। তাতে লেখা : 'নানাবিধ গ্রন্থপাঠে নিত্য দিয়া মন। তুমি হও আমাদের আপনার জন।' কথাগুলো অনেক বছর ধরে আটকানো। উপরে লেখা : 'পাঠমঙ্গল কথা'। 'এটা কোন্ মঙ্গলকাব্যে আছে?' দাদু বলে, 'হিতমঙ্গল কাব্যে।' বই পড়ায় দাদু উৎসাহ দেয় সকলকে। তবে বইয়ের আলমারিতে সকলের হাত দেওয়ার অধিকার নেই। কারণ অনেকে বই বের করে পড়ার জন্যে, কিন্তু পড়ার পরে ঠিকমতো রাখে না। কেউ কেউ বড় অযত্নে ব্যবহার করে বই। বই গুছিয়ে রাখতে না পারলে মুশকিল। দরকারের সময় হাতের নাগালে ঠিক বই থাকলে কাজের সুবিধে। দাদুর সংগ্রহে অনেক বই। নানা সময়ে কিনেছে। কারও কারও কাছে উপহার পেয়েছে। বইয়ের সঙ্গে কত স্মৃতি জড়িয়ে আছে। দাদু আগলে রাখতে চায়। অনেক সময় ভাবে, বইগুলোর যত্ন কেউ করবে না। সব হয়তো এলোমেলো হয়ে যাবে। রিয়ার উৎসাহ দেখে ভালো লাগে দাদুর। নাতনি বইকে পছন্দ করে। আর পছন্দের মানুষ হিসেবে আগে দাদু। ডাকে 'দাদাই।' দাদু বলে, 'দিদিভাই।' দুজনের বয়সের তফাত অনেকটাই। খুব ভাব আর খুব ঝগড়া দুজনের। রিয়ার মা মজা পায় দুজনের কাণ্ড দেখে। একজন শৈশবে আছে, অন্যজন দ্বিতীয় শৈশবে। দাদুর স্নেহ আর শিক্ষায় বড়ো হয়ে উঠছে রিয়া।

**বইমিত্র**

## প্রশ্নবাণ

১. সংস্কৃত ভাষাকে নিয়ে নতুন করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়েছে বিশ্বের কোন্ দেশে?

২. ভারতের কোন্ শহরকে এখন বলা হয়— 'অরেঞ্জ ক্যাপিটাল?' কেন?

৩. ভারতের কোন্ রাজ্যে প্রথম নিষিদ্ধ হয় প্লাস্টিক ব্যাগ?

৪. 'বিশ্ব চক্ষুদিবস' কবে পালন করা হয়?

৫. ভারতের কত কোটি লোকের গ্রামে বাস?

**উত্তর** ১. জার্মানিতে। ২. নাগপুর। প্রচুর কমলালেবু উৎপাদন হয়। ৩. মহারাষ্ট্রে। ৪. ১২ অক্টোবর। ৫. ৮৩ কোটি ৩০ লক্ষ (২০১১-র জনগণনা অনুসারে)।

## ছবিতে তফাত খোঁজ

## উল্টো পাল্টা

বিন্দুবাসিনী আর সরযূবালা গ্রামেই বড়ো হয়েছে। বিয়েও হয়েছে গ্রামে। অনেকে বলে, 'গ্রামের কাছে একটা সিনেমা হল হয়েছে।' দুজনে কখনও সিনেমা দেখেনি। সরযূবালার নাতি গদাই একদিন বলল, 'তোমাদের সিনেমা দেখাবো।' রিকশা-ভ্যান চড়িয়ে নিয়ে গিয়ে গেলো সিনেমা দেখাতে। হলটল নয়, ত্রিপল টাঙিয়ে বেঞ্চি পেতে ছবি দেখার ব্যবস্থা। দুই ঠাকুমা সিনেমা দেখতে বসে গেলো। মন দিয়ে দেখছে। এমন সময় পর্দায় দেখা গেলো দারুণ বৃষ্টি হচ্ছে। বিন্দুবাসিনী বলল, 'সরযূ, বড় সমস্যায় পড়লুম দেখছি।' সরযূ বলল, 'কি সমস্যা?' বিন্দুবাসিনী বলল, 'কাজটাজ শেষ না করে সিনেমা দেখতে এলুম। বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। গোরুগুলো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজবে।' সরযূ বলল, 'আমি কিন্তু খুব খুশি। ধান রোয়ার কোনও ভাবনাই রইল না।'

২

কলেজস্ট্রিটের কাপড়ের দোকানে কয়েকজন ক্রেতা ঢুকেই শাড়ি চাইলো। সেলসম্যান অনেকরকম শাড়ি ফেলে দিল সামনে। সেগুলো দেখে একজন জিজ্ঞেস করল, 'দাম কত?' বিক্রেতা জানাল '১৫০ টাকা।' ক্রেতা বলল, 'লেবেলটা বদলে দিন। চারশো টাকার লেবেল লাগান। কেননা শাড়িটা একজনকে উপহার দেওয়ার জন্যে কিনছি।'

*রামগরুড় সংকলিত*

# বাংলার প্রথম মহিলা পেশাদার সাংবাদিক



**মিতা রায়**

স্বাধীন ভারতবর্ষে স্বদেশমাতার শৃঙ্খলমোচনে অবিভক্ত বাংলায় যে আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল, তাতে তৎকালীন সময়ের অসংখ্য যুবক ও যুবতীরা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সেই আন্দোলনের জোয়ারে। শুধু সক্রিয় আন্দোলনের মাধ্যমে নয়, বিভিন্ন লেখা, পত্র-পত্রিকার মধ্য দিয়েও তারা প্রকাশ করেছেন তাদের প্রতিবাদ। সেসব পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্বে এগিয়ে এসেছিলেন যেসব মধ্যবর্তিনী মহিলারা, তার মধ্যে ছিলেন বেলা বসু, যাঁকে বলা হয় বাংলার প্রথম মহিলা পেশাদার সাংবাদিক। স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন এমন অনেক মহিলা বিপ্লবীদের কথা জানা আছে, কিন্তু নেপথ্যে থেকে যারা দেশের জন্য কাজ করেছেন, এমন অনেকের কথা আজও অজানা। মহাত্মা গান্ধীর অবিভক্ত বাংলার নোয়াখালিতে (অধুনা বাংলাদেশ) আসা এবং এখানকার দাঙ্গার সময়ে ত্রাণ শিবির গড়ে ওঠার পেছনে ছিল তাঁর বিরাট অবদান। সেখানকার বহু মানুষ, বিশেষত অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরা স্বেচ্ছায় এই শিবিরে এসে কাজ করতেন। তাঁদের মধ্যে বেলা বসু ছিলেন অন্যতম। শিবিরের খবরাখবর প্রকাশ করার জন্য হাতে লেখা পত্রিকা প্রকাশ করা হোত। তাঁরা কাজ ছিল হাইমচর শিবিরভিত্তিক। শিবির থেকে হাইমচর পত্রিকা প্রকাশিত হোত, সম্পূর্ণ হাতে লেখা। এই পত্রিকার সম্পাদনার কাজে সহায়তা করতেন বেলা বসু। পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন জিতেশ বসু। জিতেশ বসু পরবর্তীকালে বলেছিলেন যে, বেলা বসু বাংলার প্রথম পেশাদার মহিলা সাংবাদিক। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, জিতেশ বসুর সহধর্মিণী হন বেলা বসু।

গান্ধীজীর শিবিরগুলোতে কাজ করার জন্যে অনেক মহিলা যোগ দিয়ে তার অনুগামিনী হয়েছিলেন। তাদের মধ্যে বেলা বসু ছিলেন একজন অনুগামী। গান্ধীজীর শিবিরে বা যেখানেই তিনি অবস্থান করতেন, সেখানেই প্রার্থনাসঙ্গীত হোত। বেলা বসুর পুত্রের কাছ থেকে জানা যায় যে, তিনি যেহেতু ভাল গান জানতেন, সে কারণে গান্ধীজীর প্রার্থনা সঙ্গীতে তাঁরা একটা বিশেষ ভূমিকা থাকত। গান্ধী শুধু নোয়াখালি নয়, সমগ্র বাংলায় বিশেষত বরিশালে শিবিরগুলোতে মহাত্মাজীর অনেকে অনুগামী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন নেলি সেনগুপ্ত, সুচেতা কৃপালিনী, আভা গান্ধী, অশোকা গুপ্তা। শিবিরের মহিলাদের কাজ ছিল দাঙ্গায় আক্রান্ত মহিলাদের উদ্ধার করে শিবিরে নিয়ে আসা এবং তাদের পুনর্বাসন করা। এ ধরনের অসম সাহসিকতার কাজ করতে গিয়ে অনেক সময়ে এঁদের অর্থাৎ কর্মীদের গুণ্ডামির মুখোমুখি হতে হয়েছিল। এঁরা নিজেদের আত্মসম্মান রক্ষার্থে কখনও কখনও গুণ্ডাদের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করতে প্রাণ বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠাবোধ করতেন না। নোয়াখালির দাঙ্গায় যখন সমগ্র অঞ্চল অশান্তকর হয়ে উঠেছিল, তখন গান্ধীজী শান্তি স্থাপনের জন্য নোয়াখালি যান। যে ছ'জন শিষ্যাকে তিনি সঙ্গে নিয়ে যান, তাদের মধ্যে বেলা বসু অন্যতমা। কলকাতার অভয় আশ্রমে সে সময়ে তিনি থাকতেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, হাতে লেখা 'হাইমচর পত্রিকা' সম্পাদনার কাজ এত দক্ষ ও পরিশ্রমসুলভ হোত যে সেই পত্রিকা দেখে পরবর্তীকালে 'দৈনিক কৃষক' পত্রিকার সম্পাদক ক্ষেমেন্দ্রমোহন সেন বেলা বসু ও জিতেশ বসুকে সহ-সম্পাদকের মতো দায়িত্বশীল পদে নিযুক্ত করেছিলেন। ১৯৫৩-তে মাত্র একত্রিশ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। স্বল্পায়ু বেলা বসু আরও দীর্ঘদিন বাঁচলে দেশমাতৃকার সেবায় আরও অনেক কাজ করে যেতে পারতেন। তাঁর অদম্য মনোবল, সুদক্ষ সম্পাদনার কাজ অবশ্যই নারীসমাজে পরবর্তীদের প্রেরণাদায়ী হয়ে উঠবে।

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী
নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।
শান্তিনিকেতন, বোলপুর
ফোন - (০৩৪৬৩) ৫৬২২২

জাতীয়তাবাদী বাংলা
সংবাদ সাপ্তাহিক
পড়ুন ও পড়ান
স্বস্তিকা
প্রতি সংখ্যা মূল্য ৭.০০ টাকা
বার্ষিক সডাক গ্রাহকমূল্য ৩২৫ টাকা

# ভারতে সামাজিক বিপ্লব ঘটেছে

অতিথি কলম

এম ভি কামাথ

ভারতে নিঃশব্দে যে সামাজিক বিপ্লব ঘটে চলেছে সে বিষয়ে খুব কম ব্যক্তিই অবহিত। কেউই এ বিষয়ে আলোচনা করতে চায় না, কারণ এতে অযথা বিতর্ক তৈরি হয়। হতে পারে যার মুখোমুখি অনেকেই হতে চান না। সত্যি বলতে কী, এই সামাজিক বিপ্লবের পিছনে রয়েছে বেশ কয়েকটা বিষয়।

প্রথমত, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ক্রমবর্ধমান প্রযুক্তির ব্যবহার এবং দ্বিতীয়ত, মহিলাদের বিভিন্ন কর্মে নিয়োগের সুযোগ বৃদ্ধি। ফলে মহিলাদের পিতা-মাতার ওপর নির্ভরশীলতা অথবা বিবাহিতাদের স্বামীর ওপর নির্ভরতা কমছে। আরেকটা বিষয় মহিলাদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষার হার বৃদ্ধির সঙ্গে তাল মিলিয়ে তাদের চাহিদা বাড়ছে। পুরাতন মূল্যবোধ ভেঙ্গে পড়ছে, অভিভাবক ও তাদের সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটছে ক্রমাগত। কিশোর-কিশোরীরা প্রায়শই তাদের অভিভাবকদের উপদেশে কর্ণপাত করে না। তারা যেন নিজেদের তৈরি জগতের বাসিন্দা। অভিভাবকরা কীভাবে তাদের সন্তানদের কর্মধারায় বেড়ি পরাবে যখন তাদের সন্তানরা তাদের অভিভাবকদের চেয়ে বেশি রোজগার করে? আই টি শিল্পের প্রসারের সঙ্গে কারও রোজগার প্রতি মাসে ৭৫ হাজার থেকে এক লাখের মধ্যে। পরিণামে এরা আর তাদের অভিভাবকদের মধ্যে থাকতে চাইছে না, তারা চায় তাদের মতো বেঁচে থাকতে।

বেশিদিন আগের কথা নয়, গত ২০১২-র ১৯ আগস্ট 'হিন্দুস্থান টাইমসে'-এ আই আই টি-র এক স্নাতক এক নিবন্ধে লিখেছেন যে, ''আজকাল যুবক-যুবতীরা ভাড়াবাড়ীতে থাকে, বহুজনের সঙ্গে যৌনকার্যে লিপ্ত হয়ে মদ্যপানে আসক্ত হয়ে পড়ছে।'' বাবা-মায়েরা হস্তক্ষেপ করতে ভয় পায়। সম্প্রতি একটা দৃষ্টান্তে দেখা যাচ্ছে যে, এক মহিলার (যার মাত্র এক সপ্তাহ আগে বিয়ে হয়েছে) স্বামীর সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়েছে, কারণ তার স্বামীর বৃদ্ধ পিতা-মাতা তার ওপর নির্ভরশীল— স্রেফ এই কারণেই।

বহু তরুণী বাস্তবে স্বাধীনতা হারাবার ভয়ে কুড়ি বছরের আগে বিয়েতে সম্মত হয় না। এই বয়সে তারা সন্তান ধারণও করতে চায় না, কারণ স্নাতক হবার আগেই তারা জীবনের মজা পায় না। পিতা-মাতারা ক্রমশ একঘরে হয়ে পড়ে।

শহুরে মহিলারা মাদকাসক্ত হয়ে অধিক রাত পর্যন্ত বাইরে কাটাতে সংকোচ বোধ করে না। মুম্বাইয়ে অবশ্য মেয়েদের জন্য নির্দিষ্ট সুরাপানের স্থান রয়েছে। শহরের অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারছে না। কিছুদিন আগে ম্যাঙ্গালোরের একটা ঘটনা অনেকের মনে থাকতে পারে। সেখানে অবিবাহিতা ছেলে-মেয়েরা তাদের জন্মদিন পালন করেছে সুরার ফোয়ারায়। অনেকে এর প্রতিবাদ জানালে আমাদের তথাকথিত প্রগতিবাদীরা একে 'মরাল পুলিশিং' বলে আখ্যা দিয়েছে। মূলকথা হলো পরবর্তী প্রজন্মের বেলেল্লাপনা রুখতে এখন আর কারোর অধিকার নেই।

এই প্রেক্ষাপটে হিন্দুস্থান টাইমসের এক সমীক্ষায় বলা হয়েছে (জানুয়ারি ২, ২০১৩) দিল্লীর ৯২ শতাংশ ১৮-২৫ বয়সের মধ্যে থাকা তরুণরা বিভিন্ন জনসমাবেশে মহিলাদের সঙ্গে মেলামেশা করে এবং ৭৮ শতাংশ মহিলারা সেখানে যৌন নিগৃহীতা হয়ে থাকেন।

যৌনতা এখানে খোলামেলা ভাবে প্রকাশ করা হয়। এইসব ছেলে- মেয়েরা ইংরেজী দৈনিক কেনে— আমি সেইসব সাংবাদিকদের নাম উল্লেখ করছি না তবে সেইসব সাংবাদিকরা মুম্বাই, কলকাতা, দিল্লীর এইসব সংবাদপত্রে যথেষ্ট অর্ধনগ্ন নারীর ছবি ছাপছে, তাদের নিয়ে মুখরোচক সংবাদ প্রতিবেদন ছাপা হচ্ছে এবং এর প্রতিবাদে কেউ সোচ্চার হচ্ছে না, কারণ প্রতিবাদীদের হিন্দু উগ্রবাদী বলে চিহ্নিত করা হবে। কাগজগুলির প্রচার বাড়াতে এই যৌন সম্বলিত প্রতিবেদন, ছবি ছাপার প্রবণতা

"সংবাদপত্রে যথেষ্ট অর্ধনগ্ন নারীর ছবি ছাপছে, তাদের নিয়ে মুখরোচক সংবাদ প্রতিবেদন ছাপা হচ্ছে এবং এর প্রতিবাদে কেউ সোচ্চার হচ্ছে না, কারণ প্রতিবাদীদের হিন্দু উগ্রবাদী বলে চিহ্নিত করা হবে। কাগজগুলির প্রচার বাড়াতে এই যৌন সম্বলিত প্রতিবেদন, ছবি ছাপার প্রবণতা বাড়ছে ক্রমশ।"

বাড়ছে ক্রমশ। যখন আর এস এস প্রধান মোহন ভাগবত ইন্ডিয়া ও ভারতের মধ্যে একটা রেখা টানতে চেয়েছেন তখনই তথাকথিত এই বুদ্ধিজীবীরা তাঁর সমালোচনায় মুখর হয়েছে। শ্রী ভাগবত ঠিক সত্যটাই বলেছেন। আজকাল নগ্ন ছবি যথেচ্ছ সুলভে পাওয়া যাচ্ছে ইন্টারনেটের বদান্যতায়। সবচেয়ে বেদনাদায়ক হলো শহরের ছোট ছোট আবাসনে কিশোর-কিশোরীদের সঙ্গে তাঁদের বাবা-মায়ের মধ্যে তেমন মেলামেশা হয় না এবং এরা বাবা-মা-র স্নেহ, ভালবাসা বঞ্চিত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে ও তারা অন্যত্র গিয়ে মেশে। এই অবস্থায় বাবা-মায়ের সঙ্গে এরা কোনও ধর্মীয় বা পারিবারিক অনুষ্ঠানে হাজির হয় না। 'সেকুলার'দের কাছে এটাই যেন রীতি। আজকাল খুব কম বাড়িতেই পূজা-আচ্চা হয় এবং একসঙ্গে কোনও দেবালয়ে যায় না।

আজকাল মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত হিন্দুরা হিন্দুত্ব থেকে যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। গীতা, উপনিষদ থেকে উদ্ধৃতি ক্রমশ কমই শোনা যায়। বাস্তবিক অর্থে 'ইন্ডিয়ান' ও ভারতীয়ত্বের মধ্যে ফারাক গভীরতর হচ্ছে যা অনেকেই মানতে চায় না। ধীরে ধীরে এই অসুখ গ্রামেও প্রবেশ করছে। 'ইন্ডিয়ানদের' কাছে গ্রহণযোগ্য 'আইকন' হলো টিপু সুলতান আর এই শ্রেণীভুক্ত হলো গিরিশ কারনাডের মতো ব্যক্তিরা। এই শ্রেণীর মানুষরাই স্থির করে কারা দেশ শাসন করবে। এই শ্রেণীর মানুষরাই নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে বিষোদগার করেন।

আমাদের সংস্কৃতির যে অবক্ষয় হচ্ছে তা আমরা প্রত্যেকেই প্রত্যক্ষ করছি। এই দৃশ্য বেদনাদায়ক। 'স্বাধীনতা' কথাটির অপব্যবহার হচ্ছে এবং যার পরিণাম হলো এইসব অপরাধ। কিন্তু সবচেয়ে দুঃখের বিষয় হলো অনেকেই প্রতিবাদ করতে ভয় পায়, কিন্তু যারা এর বিরুদ্ধে মুখ খুলছেন বা যারা তাঁদের অনুভূতি ব্যক্ত করছেন তাঁদেরই 'সাম্প্রদায়িক' বা আরও খারাপ কথা বলে অপমানিত করা হয়। বাক্-স্বাধীনতা যেন আমাদের ধর্মনিরপেক্ষদের কাছে একচেটিয়া ব্যাপার। সমাজে গণ্ডগোল রয়েছে, ভাল আর মন্দের মধ্যে ফারাক মুছে যাচ্ছে এবং এই ক্ষতিকারক প্রবণতার বলি হলো পরবর্তী প্রজন্ম।

আমাদের মধ্যে এখন বিবেকানন্দের মতো নেতৃত্ব দেবার মানুষ নেই। দেশ তাঁর জন্ম-সার্ধশতবর্ষ পালনে লজ্জা পায় পাছে তা কেউ সাম্প্রদায়িক বলে অভিহিত করে। বর্তমান সমাজ যেন এক ভীরুতায় আবিষ্ট। সমাজে যখন বিপ্লব ঘটে তখন সমাজে উথাল-পাথাল ঘটে এবং এরকমটাই যেন ঘটছে বর্তমান সমাজে। এই বিপ্লব অভ্যন্তরীণ এবং কারুর নেতৃত্বে ঘটছে। তাই ভিতরে ভিতরে কুরে কুরে ক্ষয় হচ্ছে। আমরা আশা করতে পারি, আগামীদিনে আমরা আরও বুদ্ধিদীপ্ত, অধিকতর সুখী হবো এবং দুনিয়াকে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হবো আরও সুশিক্ষিত হয়ে।

ঐতিহাসিক কারণে এমনটা ঘটবেই এবং উন্নয়নের এটাও একটা অঙ্গ যেমনটা অতীতে উন্নয়নের ক্ষেত্রে ইউরোপ হোক বা এশিয়ায় দেখা যাচ্ছে।


## 'ফিসচুলা, পাইলস্ থেকে বিনা রক্তপাতে চিরমুক্তি'

পায়ুদ্বারের ভেতরে বা বাইরের নানা শিরা উপশিরায় জ্বালাময়, যন্ত্রণাদায়ক পরিস্থিতিই হলো পাইলস্।

পায়ুদ্বারের পাশে হওয়া গর্ত থেকে পুঁজ, গ্যাস, রক্ত বা বায়ু ইত্যাদি নির্গত হলে তা হলো ফিসচুলা। এই সমস্ত রোগে রোগীরা এর ওর কথায় টোটকা ব্যবহার করেন। তাতে যন্ত্রণা বেড়েই চলে। ডাক্তারের কাছে গেলে উপদেশ দেন অপারেশনের। পুনঃ পুনঃ অপারেশনেও সারে না। কখনও কখনও সৃষ্টি হয় নতুন সমস্যা, অথচ আমাদের আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতি বিনা অপারেশনে যন্ত্রণাহীন চিকিৎসার পথ খুঁজে পেয়েছে অনেককাল আগেই। আয়ুর্বেদে ক্ষারসূত্র ও কেমিক্যাল কর্টারির সুনিপুন মিশ্রণে **জীবক আয়ুর্বেদিক স্পেশালিটি সেন্টার** তৈরি করেছে এক অভিনব চিকিৎসা পদ্ধতি। যার সফলতম প্রয়োগে পাইলস এবং ফিসচুলার যন্ত্রণাহীন কার্যকরী চিকিৎসা করা সম্ভব। এই জাতীয় চিকিৎসায় নামমাত্র কাটা ছেঁড়ার প্রয়োজন হয়। তাই রোগী চিকিৎসার পর পায়ে হেঁটে বাড়ী ফিরতে পারেন।

না এটা কোন হাতুড়ে অস্ত্রোপচার নয়, বিগত দশ বছর ধরে যে পদ্ধতিতে এখানে শত শত রোগী চিরতরে সুস্থ হয়েছেন সেই পদ্ধতি জাপানে তোয়ামা মেডিক্যাল কলেজ এবং নেপালে ত্রিভুবন ইউনিভার্সিটির চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের দ্বারা পরীক্ষিত এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা দ্বারা (WHO) স্বীকৃত দিল্লীর AIIMS ও চণ্ডীগড়ের P.G.I. তেও এই পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে।

### কি কি চিকিৎসা হয় এই পদ্ধতিতে?

প্রোলাপ্স পাইলস্, ফিসচুলা, ব্লিডিং পাইলস, পাইলোনিডাল সাইনাস, রেক্টোভ্যাজাইনাল ফিসচুলা, ফিসার সবকিছুরই চিরতরে মুক্তি ঘটে।

### জীবক আয়ুর্বেদিক স্পেশালিটি সেন্টার

হাকিমপাড়া, হরেন মুখার্জী রোড, G.T.S. ক্লাবের নিকটে জর্জ ইনস্টিটিউট বিল্ডিং, শিলিগুড়ি

**ডাঃ এস কর,** মোবাইল নং-9434877734

*—ঃ এখানে রোগীদের দেখার সময় ঃ—*

সোমবার থেকে শুক্রবার ঃ সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২.৩০টা পর্যন্ত এবং বিকেল ৫ টা থেকে ৮টা পর্যন্ত।
ও শনিবার ঃ বিকেল ৫ টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত।

# খরা ও রাজনীতির জাঁতাকলে নাভিশ্বাস মহারাষ্ট্রের পাঁচ জেলার

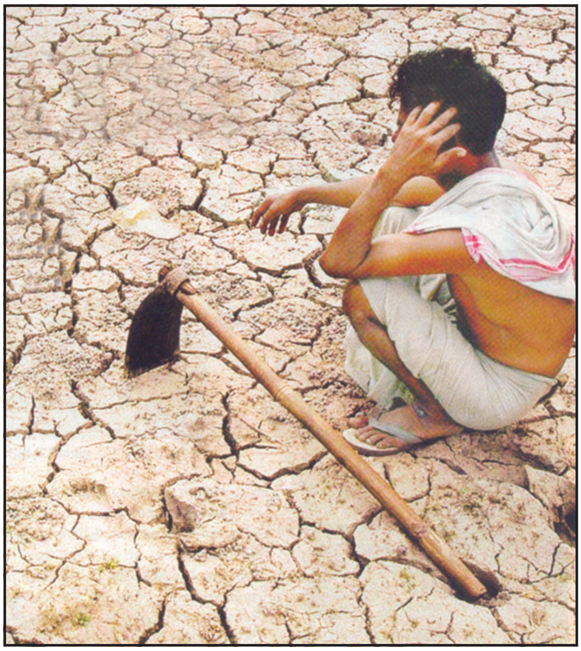

**বিরাজ রায়** ।। মহারাষ্ট্রের মারাঠওয়াড়া অঞ্চলে বছরে স্বাভাবিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৪১৫ মিলিমিটার, কিন্তু ২০১২-র মরশুমে তা কমে দাঁড়িয়েছে ২৫৪ মিলিমিটার। আর এটাই কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে ঔরাঙ্গাবাদ, জালন, বীড, লাটুর ও ওসমানাবাদ— এই পাঁচটি জেলার মানুষের কাছে। প্রকৃতির এই খামখেয়ালিপনায় প্রচণ্ড খরার মুখোমুখি চল্লিশ হাজার গ্রাম। নেমে গেছে বাঁধের জল। জলকষ্টের সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিয়েছে খাদ্যাভাবও। অনাবৃষ্টির কারণে চারদিকে খাঁ খাঁ করছে শস্যহীন মাঠ। টান পড়েছে রুজিরোজগারে, কর্মহীন হয়ে পড়েছে বহু মানুষ। ফলে কাজের খোঁজে পাড়ি দিতে হচ্ছে পুনে বা মুম্বইতে। একটি সামাজিক সংগঠন তাদের পরিসংখ্যানে দেখিয়েছে, এখনও পর্যন্ত এই পাঁচটি জেলা থেকে পনেরো হাজারেরও বেশি মানুষ কাজের খোঁজে বাইরে গেছে। তবে পরিস্থিতি এতটা খারাপ হোত না, যদি কিনা প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে তাল না মিলিয়ে রাজনৈতিক পরিবেশ তাদের সহায় হোত। জল সংকট এখানকার দীর্ঘদিনের সমস্যা, এর সমাধানে যথাযথ উদ্যোগ নেয়নি কোনও রাজনৈতিক দলও। ফলে প্রকৃতি ও রাজনীতির জাঁতাকলে নাভিশ্বাস অবস্থা মারাঠওয়াড়ার পাঁচটি জেলার।

মহারাষ্ট্রের এই জেলাগুলি মূলত কৃষিভিত্তিক। জলসেচ করে গম, ভুট্টা, জোয়ার, আঙুরের চাষ হয়। কিন্তু জলাধারগুলি শুকিয়ে যাওয়ায় জল সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেছে। স্থানীয় জায়াকাওয়াদি জলাধার যেখান থেকে সারাবছর গোটা এলাকায় সরবরাহ করা হয় চাষের জল ও পানীয় জল। এবছর খরার কারণে সেটা শুকিয়ে গেছে। এই জলাধারের একশো তিন হাজার মিলিয়ন কিউবিক ফিট জল ধরে রাখার ক্ষমতা আছে, কিন্তু বর্তমানে সেখানে মাত্র নয় হাজার মিলিয়ন কিউবিক ফিট জল আছে। খরা কবলিত এই অঞ্চলে প্রায় আট লাখ হেক্টর কৃষি জমি। জলের অভাবে গত জুলাই মাসে মাত্র কুড়ি হাজার হেক্টর জমিতে কার্পাস ও ভুট্টা চাষ হয়েছে। কিন্তু কার্পাস গাছের বৃদ্ধি এতো কমে গেছে যে কৃষকরা তা গবাদি পশু দিয়ে খাইয়ে দিতে বাধ্য হয়েছে।

এখানকার কার্পাস গাছের বৃদ্ধি সাধারণত পাঁচ ফিট হয়, এবারে তা হয়েছে মাত্র ১.৫ ফিট। ফলে হতাশায় হাহাকার করছে হাজার হাজার কৃষক। এবছর শীতে রবিশস্য হবে বলেও তারা আশা করছে না।

এরকম একটি ভয়াবহ পরিস্থিতিতে কোনও রাজনৈতিক দল তাদের পাশে দাঁড়ায়নি বলে এখানকার মানুষরা অসন্তোষ প্রকাশ করেছে। স্থানীয় এক কার্পাস ফার্মের মালিক ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন, 'ওদেরকে ব্যালটের বদলে বুলেট দেওয়া উচিত।' ওই এলাকা থেকেই মন্ত্রী হয়েছেন এন সি পি-র ছগন ভুজবাল ও কংগ্রেসের বালাসাহেব ঠোরট। ব্যক্তিগতভাবে তাদেরও অনেক কৃষি ফার্ম রয়েছে। তা সত্ত্বেও তারা সমস্যা সমাধানের কোনও উদ্যোগ নেননি। জায়াকাওয়াদি ছাড়াও এই অঞ্চলে আরও ছয়টি জলাধার রয়েছে। নদীর জল বাড়লে সেখানে কেবল পঁচিশ হাজার মিলিয়ন কিউবিক ফিট জল ধরে রাখা যায়। তিন বছর আগে মহারাষ্ট্র সরকার পুনে থেকে জল সরবরাহের দুটি প্রকল্প নেয়। কোনও অজ্ঞাত কারণে সেটাও স্থগিত থেকে যায়।

মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী পৃথ্বীরাজ চৌহান মারাঠাওয়াড়ার মানুষদের আশ্বাস দিয়ে বলেছেন— 'তাদের ওখান থেকে অন্যত্র যাওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই। আমি ব্যক্তিগত ভাবে এই বিষয়টি দেখছি।' মারাঠাওয়াড়া উন্নয়ন বোর্ডের সদস্য বিজয় দেওয়ান এ বিষয়ে বলেছেন, 'যদি নাসিক ও আহমেদনগরের এগারোটি জলাধার থেকে কিছু জল মারাঠওয়াড়াতে ছাড়া যায় তাহলে পঞ্চাশ শতাংশ সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।' তবে দীর্ঘকালীন এই সমস্যা যেভাবে এই পাঁচ জেলাকে গ্রাস করে আছে তাতে আশার মুখ দেখছেন না কেউই।

# মহিলা সুরক্ষা আইন

সুব্রত ভৌমিক

যদিও প্রতিদিন সর্বত্র ধর্ষণ সংঘঠিত হচ্ছে, দিল্লীর সাম্প্রতিক ধর্ষণ কাণ্ডের পর জনগণ হঠাৎই ধর্ষকদের মৃত্যুদণ্ড চাইছে। এই প্রসঙ্গে আমি মনে করি দেশের অধিকাংশ নাগরিকই চাইবেন— দেশের যে কোনও প্রকার আইনের বিধান বা পুনর্গঠন ভারতীয় সাংস্কৃতিক পরম্পরা, মূল্যবোধ ও জীবন চর্যার অনুসারী হওয়া উচিত। কিন্তু অত্যন্ত লজ্জার কথা মুষ্টিমেয় শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও নানা বিভাগের উচ্চপদাধিকারী কিছু ব্যক্তি আর্থিক, সামাজিক, রাজনৈতিক তথা জীবনের সর্বক্ষেত্রেই পাশ্চাত্যের জীবনধারা অনুকরণ করে চলেছেন। এই ব্যক্তিগণ প্রথমে বৃটিশ, তারপর রাশিয়া আর এখন উন্নত আমেরিকার ছাঁচ অনুকরণ করছেন। ঠিক সেই কারণেই অপকর্ম সংঘঠিত হওয়ার পর শাস্তির বিষয়ে তারা অধিক চিন্তিত। কিন্তু মানুষ যাতে ঘটনাক্রমে, দুর্ঘটনাক্রমে অথবা ধীরে ধীরে অপরাধীতে পরিণত না হয় এবং অপরাধের হার হ্রাস করার জন্য সুস্থ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ রচিত হয়, সেই সম্পর্কে তাদের কোনওরূপ উদ্যোগ নিতে দেখা যায় না। সামাজিক পরিকাঠামোই সর্বপ্রকার অপরাধ নিবৃত্তির উপায় হওয়া উচিত— কেবলমাত্র আইন প্রণয়ন নয়!

বিষয়টিকে স্পষ্ট ও বিস্তারিত ভাবে বোঝার জন্য নিচে দষ্টান্তগুলি দেওয়া হলো :

(ক) ভারতবর্ষের মতো উষ্ণ দেশে মদ্যপান আদৌ জরুরি কিনা এ সম্পর্কে কেউ ভাবছে না। সম্ভবত অধিকাংশ বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ও উচ্চপদস্থ আধিকারিক নিজেরাই পানাসক্ত। তাই তাঁরা কিছু বলছেন না (বিশ্বভারতীর উপাচার্য অতিথি আপ্যায়নের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিলের অর্থ ব্যয় করে মদ পরিবেশন করায় অভিযুক্ত হন। (সূত্র- সংবাদ মাধ্যম)। অধিকাংশ পানাসক্ত ব্যক্তির আত্মমর্যাদা ও সংযম থাকে না বলে যে কোনও প্রকার দুস্কর্ম, যথা--- গৃহে অশান্তি, ডাকাতি, খুন, গাড়ি চাপা দেওয়া থেকে শুরু করে ধর্ষণের মতো সর্বাধিক ঘৃণিত অপরাধ পর্যন্ত করে থাকে।

(খ) আমরা জানি যে ভারতীয় সংস্কৃতির উষালগ্ন থেকেই সমাজ নারী জাতিকে

মর্যাদার অতি উচ্চাসনে বসিয়েছে। কিন্তু বর্তমানে আমাদের ভবিষ্যৎ নাগরিক ছোটরা কি দেখায় অভ্যস্ত হচ্ছে? ব্যক্তি স্বাধীনতা, অবাধ যৌনতা, ব্যবসা ইত্যাদির নামে কাম উদ্রেককর বিজ্ঞাপন, মনোরঞ্জনের নামে অশালীন দৃশ্য, স্বল্প বসনা অর্ধনগ্ন নারী শরীর--- যা কেবলমাত্র বিশেষ ক্ষেত্রে বয়স্কদের জন্যই দেখানো যেতে পারে। ভারতীয় জীবন দর্শনে এটা কি নারী মর্যাদা বৃদ্ধিকারী? কোনও প্রকার দ্বিধা, লজ্জা, ভয় না করেই অধিকাংশ কিশোর-কিশোরী বাবা মার পাশে বসে উক্ত দৃশ্যাবলী দেখছে। এটাই নাকি আধুনিক, উন্নত ও পরিণত ভারতের পরিভাষা!! কিছু বুদ্ধিজীবী এর পক্ষে ওকালতি করে বলেন যে এই সব প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সমাজ পরিণত হচ্ছে কারণ, ছোটোরা বিনা খরচেই যৌন শিক্ষা লাভ করছে। হায়! কি বৈপ্লবিক এই পাশ্চাত্য জীবনধারা— এই ধারা অনুশীলনের ফলে কিশোর মনে এমন ধারণা তৈরি হচ্ছে যে নারী সহজলভ্য এক ভোগ্যবস্তু মাত্র এবং তাদের জন্ম পিতা মাতার সাময়িক উত্তেজনা ও যৌন উপভোগের কারণে। এমতাবস্থায় পিতামাতার প্রতি সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শনের মানসিক অবস্থা ছোটদের আর থাকছে না। এই সব কারণেই উগ্র, শৃঙ্খলাহীন অবাধ যৌনতা ও পার্টি-পানশালার সংস্কারে অভ্যস্ত প্রজন্মের সৃষ্টি হচ্ছে। কারও এ বিষয়ে মাথা ব্যথা নেই। কারণ এদের নিয়ন্ত্রণ করার সাহস নেই। এরা রাজীব গান্ধীর আশীর্বাদে ১৮ বছরেই সম্মানীয় ভোটার। কেউ এদের ভোট হারানোর সাহস দেখানোর ক্ষমতা রাখে না। 'মহিলাদের মর্যাদার চোখে দেখবে'— এদের কাছ থেকে কি এই আশা করা যায়?

কেন নারী স্বার্থরক্ষায় সক্রিয় ব্যক্তিগণ এরূপ বিজ্ঞাপন, মনোরঞ্জন মেনে নিচ্ছেন? কেন জাতীয় মহিলা কমিশন এ বিষয়ে নীরব? তা হলে এটাই কি প্রমাণিত হয় না যে এরা নিজেরাই সব কিছু পাশ্চাত্য মানসিকতায় দেখতে অভ্যস্ত।

(গ) কিছু শিক্ষকের বিচ্ছিন্ন রূঢ় ব্যবহারের কথা বাদ দিলে আমাদের সমাজ মনে করে যে শিক্ষক যা করেন তা ছাত্রের ভালোর জন্যই করেন। তাই ভারতীয় সংস্কৃতিতে শিক্ষককে দেবতার মর্যাদা দিয়ে 'আচার্য দেবঃ ভবঃ' এই সম্বোধন করা হয়।

কিন্তু বর্তমানে প্রচার মাধ্যমে কিছু ব্যতিক্রমী ঘটনার পুনঃ পুনঃ প্রচারের নেতিবাচক প্রভাব শিক্ষককে খলনায়কে পরিণত করছে। বেশ কিছু বিদেশের মদত পুষ্ট মানবাধিকার সংস্থা বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য আক্রমণাত্মক ভাবে প্রচারে সক্রিয় হয়েছে। পরিণামে শিক্ষকের দেওয়া সামান্য শাস্তিও আদালতের বিষয় বস্তুতে পরিণত হচ্ছে। এমন পরিবেশে প্রাথমিক অবস্থা থেকেই কি আমাদের শিশুরা একটা নিয়ন্ত্রণহীন সমাজে বেড়ে ওঠার দিকে অগ্রসর হচ্ছে না? শিক্ষকরা নিয়মিত ভাবে ছাত্র পেটাবেন এমন

পরামর্শ আমি দিচ্ছি না। তবে শিক্ষকের হাতে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা কিছু পরিমাণে থাকা উচিত। কারণ পরিচালন ব্যবস্থার মূল কথা হলো কর্তৃত্বের সঙ্গে দায়িত্ব ও জবাবদিহি বা কৈফিয়তের বাধ্যবাধকতার সামঞ্জস্য বিধান।

উচ্চ বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে একই অবস্থা দেখা যায়। ভারতীয় সংস্কৃতি ও জীবন ধারায় এই প্রতিষ্ঠানগুলি জ্ঞানদেবীর আরাধনাস্থল। এগুলি ক্লাব, শপিং মল, হোটেল, পানশালা, রেস্তোরা ইত্যাদি নয়। এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ বজায় রাখা ও ছাত্রীদের বিরুদ্ধে কোনওরূপ অপকর্ম যাতে সংঘটিত না হয় তার জন্য পোযাক-বিধিও থাকা উচিত।

শিক্ষার উৎকর্ষের কৃতিত্বে জাতীয় স্বীকৃতি প্রাপ্ত কলকাতার একটি মর্যাদাসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের অফিস ছাত্রছাত্রীরা ঘেরাও করে রেখেছিল। তিনি সিসি টিভি বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু স্থানে বসাতে চেয়েছিলেন। ঘেরাও এর পক্ষে তাদের যুক্তি ছিল এ ধরনের পদক্ষেপ তাদের ব্যক্তিগত গোপনীয়তায় হস্তক্ষেপের সামিল (সূত্র-সংবাদ মাধ্যম)। কথা হলো, বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর কি বাথরুম, শোবার ঘর বা ব্যক্তিগত বিনোদন ক্ষেত্র যে সেখানে গোপনীয়তা থাকবে? এতে বোঝা যায় যে তথাকথিত বুদ্ধিজীবী, আধুনিকতাপন্থী বিচারপতি, নারীবাদী ও কেতাদুরস্ত যুবপ্রজন্ম পাশ্চাত্য জীবনধারার যে অন্ধ অনুরকণ করছেন তা ভারতীয় সংস্কৃতি ও জীবনযাপন পদ্ধতির সম্পূর্ণ বিপরীত ও ক্ষতিকারক দিক।

অতএব, উপরের উদাহরণগুলি পরিষ্কার করে দেয় যে আমাদের নেতা, সরকার, বুদ্ধিজীবী, নাগরিক সমাজ এমন এক সমাজের নীরব দর্শক, যে সমাজ সমস্ত রকম উপাদান সহ ধীরে ধীরে অপরাধের সূতিকাগৃহে পরিণত হচ্ছে। আধুনিক, উন্নত এবং সাবালক ভারত গড়ার নামে এরা পাশ্চাত্য মডেলের অন্ধ অনুকরণ করে এমন এক সামাজিক নমুনা গড়তে চাইছে যে, ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বুঝছে www এর অর্থ— Wealth, Wine, Women— অর্থ, মদ ও মেয়েমানুষ। সামাজিক অবস্থার এমন পরিকাঠামো ও নমুনা পাশবিক প্রবৃত্তির স্ফুরণে সহায়ক। পাশ্চাত্যের দেশগুলোর দিকে তাকালেই সেটা বোঝা যায়। এটাই LPG মডেলের যথা Liberalisation, Privatisation, Globalisation--- উদারিকরণ, বেসরকারিকরণ ও ভুবনীকরণের অন্ধ অনুকরণের পরিণতি।

প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের যুবকদের সামনে মূল্যবোধের কোনও কাঠামো আমরা তুলে ধরতে পারছি না। জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট স্টিভেন মুলারের উক্তিটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বলে এখানে উল্লেখ করছি— "Universities are turning out highly skilled barbarians because we don't provide a frame work of values to young people who more and more are searching for it"— "ইউনিভার্সিটিগুলো অতি দক্ষ বর্বর উৎপাদনকারীতে রূপান্তরিত হচ্ছে, কারণ যুবকদের সামনে মূল্যবোধের কোনও অভিষ্ট কাঠামো আমরা রাখছি না— যদিও যুবকরা এমনই কিছু পাওয়ার খোঁজ বেশি মাত্রায় করছে।"

যখন আমাদের যুব সমাজের কাছে আদর্শ দেশ আমেরিকা তখন ওই দেশেরই কিছু শুভ ও গঠনমূলক ভাবনার মানুষ তাদের সামাজিক পতন দেখে বিচলিত। আমেরিকার প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট আলগোরে প্রাচ্য সংস্কৃতি ও পরিবার প্রথার আকর্ষণে আওয়াজ তুলেছেন— "পুবের দিকে দেখ।" প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ১৪ বছরের আগে তাঁর মেয়েদের মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে দেননি। এমন কি ব্যক্তিগত সেলফোনে মেয়েরা কি কথা বলছে তাও জানার জন্য ওদের মা বার বার ঘরে ঢোকেন। (সূত্র-সংবাদ মাধ্যম)। এটা কি আমাদের পারিবারিক ব্যবস্থায় প্রচলিত নিয়ন্ত্রণ বিধির কথা মনে করায় না? আমি দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করি, ভারতীয় জীবন দর্শন পাশবিক প্রবৃত্তি সংযমের সহায়ক উপায়। পাশবিক প্রবৃত্তিই সর্বপ্রকার অপরাধের আকর বা উৎস। তাই আমাদের বুদ্ধিজীবী পূর্বপুরুষগণ যাঁদের ঋষি বলে জানি তাঁরা আইন প্রণয়নের সঙ্গে সঙ্গে আত্মসংযম বজায় রাখার পক্ষে সহায়ক সামাজিক বাতাবরণকেও গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

নিচের পরিসংখ্যান আমার মতের ন্যায্যতা প্রমাণ করবে। পাশ্চাত্যের অধিকাংশ দেশ শীতপ্রধান। অবাধ যৌন সম্পর্কের সংস্কৃতি সেখানে বিদ্যমান। তুলনায় ভারত সহ প্রাচ্যের অধিকাংশ দেশ গ্রীষ্মপ্রধান (এই প্রাকৃতিক পরিবেশে ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় তুলনায় যৌন উত্তেজনা বা আগ্রহ অনেক বেশি)। এতৎ সত্ত্বেও উন্নত পাশ্চাত্য দেশ এবং অন্য বহু দেশ যেখানে প্রতি এক লক্ষ জনসংখ্যায় ধর্ষণের হার ভারত ও এশিয়ার দেশগুলির তুলনায় অনেক বেশি। এর কারণ, তথাকথিত বুদ্ধিজীবী ও আধুনিকতাবাদীদের (প্রকৃতপক্ষে 'অতি দক্ষ বর্বর'— স্টীভেন মুলারের উক্তি অনুসারে) সর্বপ্রকারের অশুভ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও অধিকাংশ ভারতবাসী উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত পবিত্র সুপ্রাচীন সাংস্কৃতিক জীবন দর্শনে বিশ্বাসী যাকে আমরা সংস্কার বলে থাকি।

আমেরিকা— ২৭.৩, বৃটেন—২৮.৮, জার্মানি— ৯.৪, রাশিয়ান ফেডারেশন— ৩.৪, ফিনল্যান্ড— ১৫.২, নরওয়ে—১৯.২, সুইডেন--- ৬৩.৫, অস্ট্রিয়া--- ১০.৪, বেলজিয়াম— ২৭.৯, অস্ট্রেলিয়া— ৭৯.৫, নিউজিল্যান্ড— ২৫.৮, দক্ষিণ আফ্রিকা— ১২০.০, ভারত— ১.৮, জাপান— ১.০ (বৎসর---২০১০) (প্রতি ১ লক্ষ জনসংখ্যায়) (সূত্র : রাষ্ট্রসংঘ ধর্ষণ পরিসংখ্যা)

Wikipedia Link : http :// en.wikipeia.org.wiki.Rape Statistics)

যদিও আমি ধর্ষণকারীদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার বিরোধী নই কিন্তু উপরের প্রেক্ষাপট মাথায় রেখে নিম্নের পরামর্শগুলি জানাতে চাই :

১। যদি মৃত্যুদণ্ড বা অন্য কোন কঠোর শাস্তি প্রবর্তন করা হয় তাহলে আমি মনে করি নিচের বিষয়গুলি বিচক্ষণ ও মৌলিক বিবেচনার দাবি রাখে।

(ক) মৃত্যুদণ্ড যুগপৎ ২টি অপরাধ

সঙ্ঘটিত করবে যথা— ধর্ষণ ও অপরাধের মুখ্য ও গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী বিলোপের জন্য হত্যা। অনেক প্রথিতযশা আইনজীবী ইতিমধ্যে এরূপ মত ব্যক্ত করেছেন। (খ) প্রস্তাবিত আইনের অপব্যবহার : আইনটি যাতে ধারা ৪৯৮-এর মত লিঙ্গ বিভেদমূলক না হয় দেখা উচিত। তিক্ত অভিজ্ঞতা হলো পণ প্রথা কমাতে এই ধারা ব্যর্থ হয়েছে। উপরন্তু জঘন্য চরিত্রের মহিলারা অপপ্রয়োগের মাধ্যমে ধারাটির উদ্দেশ্যকে অকেজো করছে। ফলতঃ প্রকৃত নির্যাতিতারা দ্রুত সঠিক রায় পাচ্ছে না। এটা যাতে অনিশ্চিত ও অনির্দিষ্ট বিষয়ে পর্যবসিত না হয়, প্রস্তাবিত সংশোধনীতে সেটি সুনিশ্চিত করার পর্যাপ্ত সুযোগ রাখা উচিত। (গ) ধর্ষণের সংজ্ঞা : ভারতীয় সংস্কৃতি ও জীবন ধারার কথা মাথায় রেখে ধর্ষণের বিধিসম্মত ব্যাখ্যা হওয়া উচিত নারীর দেহ, মনের ও আত্মার পবিত্রতার বিষয়। শুধুমাত্র তার শারীরিক অধিকারের বিষয় নয়— যা পুরোপুরি একটি পাশ্চাত্য ধারণা এবং ভারতীয় সংস্কৃতি বিরোধী। ধর্ষণের সংজ্ঞার পাশ্চাত্য ধারণা আমাদের সমাজের গভীরে আঘাত হানবে। প্রথমত, পতিতা ও অবাধ যৌনতায় বিশ্বাসী নারীগণ আইন বলে সৃষ্ট ব্যবস্থাকে হাতিয়ার করে ভয় দেখিয়ে প্রতারণায় লিপ্ত হবে। দ্বিতীয়ত, পাশ্চাত্য ধারণার সংজ্ঞা একজন পতিতা ও অন্যান্য নারীর যথা— ডাক্তার, শিক্ষিকা, প্রবন্ধক বা গৃহবধূর সঙ্গে সামাজিক মর্যাদার ভেদাভেদ সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে। ধর্ষণের ফলে দেহ, মন ও আত্মার পবিত্রতা একেবারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়— এ কারণে একজন নারী ন্যায় বিচারের দাবি করতে পারে। একই কারণে একজন পতিতা কী সম ন্যায় বিচারের দাবি করতে পারে? এই প্রশ্নটাই এখন অতি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনার বিষয়।

পশ্চিমবঙ্গের একজন মহিলা সাংসদ ব্যক্তিগতভাবে এবং অসম বিধানসভার একজন মহিলা সদস্য বিধানসভায় একই প্রশ্ন তোলায় যে ক্ষেত্রে অধিকাংশ সদস্যের দ্বারা অভিনন্দিত হয়েছেন (সূত্র : সংবাদ মাধ্যম)। এমন নয় যে মাননীয়া সাংসদ ও বিধান সভার মহিলা সদস্য অনুভূতি ও বোধশক্তিহীন, পুরুষ প্রধান সমাজের প্রতিনিধি বা মধ্যযুগীয় বর্বর। এই ঘটনার মানবাধিকার কমিশন ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করে দিয়েছে। এমন কেন ঘটছে? আমার মতে এটা দুটি আলাদা সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গির সংঘাত ছাড়া আর কিছু নয়। একটি পাশ্চাত্য অপরটি ভারতীয়। দায়িত্বশীল নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও নিজস্ব সাংস্কৃতিক ভাবনাকে অস্বীকার করে শুধুমাত্র আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে উন্নত বলেই পশ্চিমের দৃষ্টিভঙ্গির অন্ধ অনুকরণ করা কি ঠিক? কোনও ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা আয়োগ উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া আমাদের সুপ্রাচীন সংস্কৃতির ঊর্ধ্বে নয়। আমার মতে এটি জনগণের যুক্তি, তর্ক ও আলোচনার বিষয় হওয়া উচিত।

২। আমি যদিও ধর্ষকের মৃত্যুদণ্ডের বিপক্ষে নই, তথাপি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে তথাকথিত পাশ্চাত্য মানসিকতার ব্যক্তিগণের এই দাবি করার কোনও অধিকার নেই। কারণ একদিকে আধুনিক উন্নত ভারত গড়ার নামে জীবনের সর্বক্ষেত্রে যখন তারা অন্ধভাবে পাশ্চাত্য অনুকরণ করছে, আর যে সমস্ত ব্যক্তি ও সংগঠন এর বিরোধিতা করছে তাদের প্রতিক্রিয়াশীল, রক্ষণশীল, মৌলবাদী এবং মধ্যযুগীয় বলে গালি দিচ্ছে তখন তারাই আবার ধর্ষকদের মৃত্যুদণ্ড দাবি করছে। কিন্তু পাশ্চাত্যের কোনও উন্নত দেশে ধর্ষণকারীর মৃত্যুদণ্ডের সাজা হয় না। এটা কি ভণিতা নয়? এই দাবি করে তারাই কি নিজেদের মধ্যযুগীয় বর্বর বলে প্রমাণ করছে না?

সুতরাং স্মরণ করাতে চাই যে মৃত্যুদণ্ড বা অন্য কোনও কঠোর শাস্তির বিধান যদি প্রবর্তন করা হয় সেক্ষেত্রে নিম্নলিখিত সমস্ত সামাজিক ও আইনবিধিবদ্ধ ব্যবস্থার পাশাপাশি এমন এক সামাজিক পরিবেশ রচনা করতে হবে, যা আত্মসংযম বজায় রাখতে ও পাশবিক প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণের অনুকূল হবে। রক্ষণশীলতা, মৌলবাদ, মধ্যযুগীয় বর্বরতা, মানবাধিকার, ব্যক্তি স্বাধীনতা, নারীমুক্তি প্রভৃতি কোনও আপত্তিই উক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে না ওঠে তা নিশ্চিত করতে হবে—

(ক) ''মদের দোকান/পানশালা থাকবে জনবসতি থেকে দূরে নির্জন স্থানে''— চাণক্যর এই নীতি আজও একই রকম উপযোগী। (খ) মহিলাদের কোনও ভাবেই মদের দোকান/পানশালায় প্রবেশের অনুমতি দেওয়া উচিত হবে না (এ বিষয়ে দেশব্যাপী মহিলাদের গণভোট নেওয়া যেতে পারে)। (গ) ২৫ বছরের আগে পানশালা/ মদের দোকানে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া উচিত হবে না। মানসিক পূর্ণতা বা পরিপক্বতার এটাই বিজ্ঞানসম্মত বয়স। (ঘ) প্রচার বা মনোরঞ্জনের নামে ভারতীয় সংস্কৃতি বিরোধী অমার্জিত/ অশ্লীল বিষয় কোনও মাধ্যমেই দেখানো উচিত হবে না। (ঙ) মদ্যপান করে ধর্ষণ সহ যে কোনও অপরাধের শাস্তি স্বাভাবিক অবস্থায় করা একই অপরাধের শাস্তির চেয়ে তিন গুণ বেশি হওয়া উচিত। (চ) মদ খেয়ে, গাড়ি চাপা দিয়ে হত্যা করলে সেই হত্যাকে ৩০২-এ ধারার আওতায় এনে হত্যাকারীর শাস্তি বিধান করতে হবে। (ছ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিষয় সমূহ যথা নিয়মানুবর্তিতা, অনুশাসন, পোষাকবিধি, চরিত্র গঠন প্রভৃতি বিষয়ে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার ও ক্ষমতা আরও বেশি মাত্রায় শিক্ষকদের হাতে দিতে হবে। অভিভাবক, ছাত্র ও শিক্ষকের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তি হওয়া উচিত পারস্পরিক বিশ্বাস ও সম্মানবোধ যা ভারতীয় পরম্পরা অনুসারী। কেবলমাত্র অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে এবং যথেষ্ট কারণ থাকলেই কোর্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হস্তক্ষেপ করতে পারবে। তদ্ভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কোর্টের হস্তক্ষেপ অনুচিত। (জ) কলেজ স্তরে ন্যূনতম ৬ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণ বাধ্যকতামূলক করতে হবে অন্যথায় স্নাতক শংসাপত্র দেওয়া যাবে না। আমি কোনও বিশেষজ্ঞ নই। উপরে উল্লিখিত বিবৃতি ও পর্যবেক্ষণ উপস্থাপনাকালীন ভুলবশত, জ্ঞানত বা অজ্ঞানত যদি কোনও সীমা লঙ্ঘন করে থাকি একজন নবীশ বিবেচনা করে অবশ্যই আমাকে মার্জনা করবেন এরূপ— আশা করি।

***[লেখক পেশায় চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট]***

# পেশা নয়, সেবায় ব্রতী এক ফোটোগ্রাফার

অন্য রকম

**বিরাজ রায়**।। ফোটোগ্রাফারদের পেশার থেকে ছবি তোলার নেশাটাই হয়তো বেশি। আর এই নেশাটাই কতজনকে তৈরি করেছে সেরা ফোটোগ্রাফার। কিন্তু পেশা তো নয়ই, নেশাটাও তার কাছে চরম বিলাসিতা, এমন একজন ফোটোগ্রাফার মুকুন্দ মানে (৪২)। শুধুমাত্র সদ্য স্বজনহারাদের হাতে তৎক্ষণাৎ ছবি তুলে দেওয়ার জন্যই যে বেছে নিয়েছে ফোটোগ্রাফির পেশা। না, পেশা নয় ব্রত। যদিও তার আসল পেশা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পানমশলার জোগান দেওয়া। তবুও এর মধ্য দিয়েই চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তার ছোট্ট স্টুডিও— 'মুফত ফটো সেবা'। পুনের বৈকুণ্ঠ শ্মশানেও ঝুলছে যার বিজ্ঞাপন। যেখানে স্বজনহারাদের ছবি তৈরি করে দেওয়া হয় বিনেপয়সাতেই।

*আলোকচিত্রী মুকুন্দ মানে।*

কিন্তু এমন একটি ভাবনা তার মাথায় কেন এলো? এর উত্তরে মুকুন্দ জানিয়েছে, দু-বছর আগে কাকার মৃত্যুর পর তার ছবি তৈরি করতে গিয়ে এই বিষয়টি আমার মাথায় আসে। মুকুন্দের কাছ থেকেই জানা গেছে তার কাকার মৃত্যুর চারদিন পর চৌথা অর্থাৎ শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান হয়েছিল, তাতেই প্রয়োজন পড়েছিল বাঁধাই করা একটি বড়ো ছবির। কিন্তু সেটা জোগাড় করতে গিয়ে তাকে এবং তার পরিবারকে সেদিন নিরাশ হতে হয়েছিল। রবিবার থাকার জন্য অধিকাংশ স্টুডিও বন্ধ ছিল। আর এতো স্বল্প সময়ে অন্য কেউ ছবি তৈরি করে দিতে পারেনি। তাতে অবশ্য আটকায়নি, মুম্বাইয়ের একটি স্টুডিও থেকে ছবি বানিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু এই ঘটনাটি মুকুন্দের মনে বড়ো আঘাত দিয়েছিল। তারপরেই সে ফোটোগ্রাফি শেখার সিদ্ধান্ত নেয়। নিজস্ব একটি স্টুডিও করতে কতো টাকা লাগবে সে কথাও ভাবেনি। ফোটোশপ শেখার জন্য সরাসরি চলে যায় একটি কমপিউটার ট্রেনিং সেন্টারে। কিন্তু কোর্স ফি ছয় হাজার টাকা। কোথা থেকে আসবে টাকা? তখন একশো টাকা দিয়ে কিনে নেয় ফোটোশপ শেখার একটি বই। বইটি পড়ে মনোবল যেন আরেকটু বেড়ে যায়। দশ হাজার টাকা দিয়ে সে পুরানো একটি কমপিউটার কেনে। তারপর আসে একটি ডিজিটাল ক্যামেরা। এভাবেই গড়ে ওঠে তার এই স্টুডিও। বন্ধু ও প্রতিবেশীদের মধ্যে প্রচার করে দেয় সদ্য স্বজনহারাদের সে বিনে পয়সায় ফোটো তৈরি করে দেবে। তারও একমাস পরে মুকুন্দ বৈকুণ্ঠ শ্মশান কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করে শ্মশানে তার স্টুডিওর একটি বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য। তারাও আপত্তি জানায়নি, কোনও চার্জ না নিয়েই বিজ্ঞাপনটি ঝোলাতে দেয়।

শহরের একটি ছোট্ট ঘর, সেখানেই স্ত্রী ও পাঁচ বছরের মেয়েকে নিয়ে মুকুন্দের সংসার। তার মধ্যেই ঠাঁই নিয়েছে স্টুডিওর সরঞ্জাম, কমপিউটার, প্রিন্টার, ল্যামিনেশন মেসিন ও একটি স্ক্যানার। সে নিজের কমপিউটারেই ছবির সব কাজ করে নিয়ে কালার প্রিন্ট ও বাঁধাই করার জন্য পাঠিয়ে দেয় পাশের কোনও স্টুডিওতে। আর খুব অল্প সময়ের মধ্যেই করে। দরকার হলে সাদা-কালো প্রিন্ট বের করে দেয়। মুকুন্দ জানিয়েছে --- 'আমি এধরনের পরিবারগুলিকে সবসময়ই সাহায্য করি, যাতে অনুষ্ঠান করতে তাদেরকে কোনও সমস্যায় পড়তে না হয়।'

এভাবেই নিঃশব্দে মুকুন্দ মিটিয়ে যাচ্ছে তার সেবা ভাবনা। সেরারাই সবসময় সেরা ফোটোগ্রাফার হয়, এতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু মুকুন্দ যেন তাদের থেকে আরও অনেক বেশি সেরা।


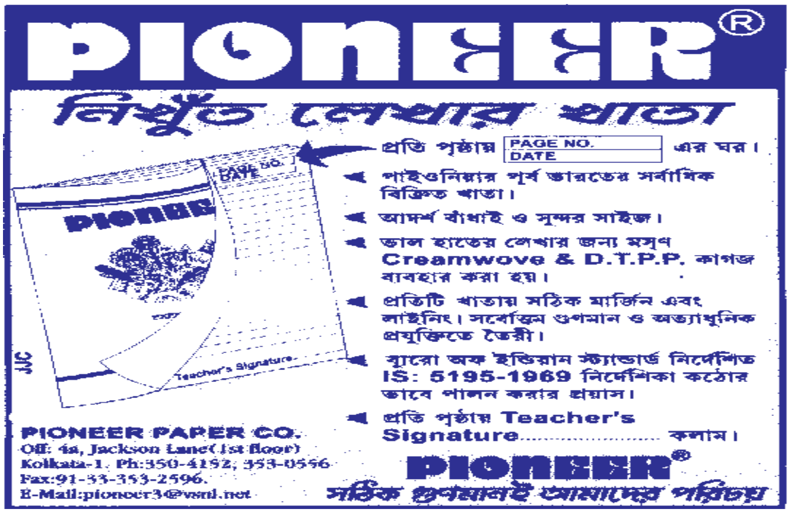

ডঃ নজরুল ইসলাম রচিত
মুসলমানের করণীয়
পুস্তকের জবাবে

# হিন্দুর করণীয়

নিত্যরঞ্জন দাস

মূল্য ঃ ৫০.০০ (পঞ্চাশ টাকা মাত্র)

এলাহাবাদ পূর্ণকুম্ভের জন্য
প্রকাশিত হল

# প্রয়াগ পূর্ণকুম্ভ

— লাল ঠাকুর

—: প্রাপ্তিস্থান :—

## ঘোষ এন্ড চক্রবর্তী

(পাবলিশার্স এন্ড বুক সেলারস্)

১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতাঃ৭০০ ০৭৩

ফোন - ৯৭৪৯৪৩৮৪৮৮

ভারতীয় হোমিওপ্যাথিক সমাজ আয়োজিত

# ২২তম হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক সম্মেলন

তারিখ ঃ ২৪ মার্চ ২০১৩/রবিবার
(সকাল ৮-৩০—বিকাল ৪-৩০)

## স্থান ঃ কেশব ভবন

৯এ, অভেদানন্দ রোড (বিডন স্ট্রিট)
মানিকতলা, কলকাতা-৬
শুল্ক ঃ ২০০ টাকা

যোগাযোগ ঃ কেশব ভবন (স্বাগত বিভাগ)
(বিকাল ৪টা—সন্ধ্যা ৭টা)

| | | |
|---|---|---|
| ডাঃ পি. কুণ্ডু | — | ৯৮৩১৪৯১৬৫৮ |
| ডাঃ এন. অধিকারী | — | ৯৮৩১৭১০৭৪৪ |
| ডাঃ এ. চৌধুরী | — | ৯৬৪৭৬৫৬২৪৫ |
| ডাঃ বি. ঘোষরায় | — | ৯০৬২০৩৪৮৯১ |
| ডাঃ জে. কুণ্ডু | — | ৯৪৩৩৮২০১৮৫ |

ডিস্ট্রিবিউটর চাই, ডিস্ট্রিবিউটর চাই, ডিস্ট্রিবিউটর চাই, ডিস্ট্রিবিউটর চাই,

WANTED DISTRIBUTOR

ময়লার চরম শত্রু কাপড়ের পরম বন্ধু

# গ্লোবাল ফাইটার

প্রতিনিধিবিহীন এলাকায়
ডিস্ট্রিবিউটরের জন্য

—ঃ যোগাযোগ করুন ঃ—
মোবাইল নং-০৩৩-৩২৬১০৩৪৫,
৯৬৮১৬০০৯৭৫

# সযত্নে তৈরি কাঁথির ইতিহাস

**কৌশিক গুহ**

বঙ্কিমচন্দ্র যে সময় 'কপালকুণ্ডলা' লিখেছিলেন তখন তিনি ইংরেজ সরকারের কর্মী। কর্মস্থল নেগুঁয়া পরগণায়। সমুদ্রতীর জঙ্গল বালিয়াড়ি সব মিলিয়ে অন্যরকম রূপ। লেখকের কল্পনা থেকে সৃষ্টি হয়েছিল অসাধারণ চরিত্রগুলি— নবকুমার, কপালকুণ্ডলা, কাপালিক। আজকের সমৃদ্ধ কাঁথি শহর বা আশপাশের জীবনচিত্রের সঙ্গে সেই সময়ের রূপ মেলানো যাবে না। কিন্তু কাঁথির মানুষ শ্রদ্ধায় স্মরণ করেন বাংলা সাহিত্যের ভগীরথ তুল্য লেখককে 'কপালকুণ্ডলা'র জন্যে। কারণ ওই উপন্যাসের পটভূমি অতীত দিনের কাঁথি। সেই বৃত্তান্ত সরিয়ে রেখে এসময়ের ইতিহাসজিজ্ঞাসুরা বঙ্কিমচন্দ্রের অন্য লেখা থেকে প্রেরণার রসদ খুঁজে পান। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন, 'বাঙ্গালার ইতিহাস নাই, যাহা আছে, তাহা কতক উপন্যাস, কতক বাঙ্গালার বিদেশী বিধর্মী অসার পরপীড়কদিগের জীবনচরিতমাত্র। বাঙ্গালার ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙ্গালার ভরসা নাই। কে লিখিবে? তুমি লিখিবে, আমি লিখিব, সকলেই লিখিবে। যে বাঙ্গালী, তাহাকেই লিখিতে হইবে। আইস, আমরা সকলে মিলিয়া বাঙ্গালার ইতিহাসের অনুসন্ধান করি।' এই প্রেরণা-মন্ত্রকে সামনে রেখে কাঁথির ইতিহাস লেখায় ব্রতবদ্ধ হয়েছিলেন কয়েকজন জিজ্ঞাসু। তাঁদের নেতৃত্ব দিয়েছেন অমলেশ মিশ্র। অনেক চিন্তাভাবনা পরিশ্রমের ফসল 'অবিভক্ত কাঁথি মহকুমার ইতিবৃত্ত', ১২৫৪ পৃষ্ঠার বইটি প্রকাশিত হয়েছে এবছরে। বৈশাখের প্রথম দিনে। গ্রন্থ প্রস্তুতির কাজ চলেছে কয়েকবছর ধরে। অনেকের শ্রমে এই আঞ্চলিক ইতিহাসের বইটি তৈরি হয়েছে।

কাঁথি মহকুমা ভাগ হয়েছে দশবছর আগে। ২০০২ সালে। ১৮৫২ সালে কাঁথি মহকুমা গড়ে ওঠে। ইংরেজ শাসকদের উচ্চারণে অসুবিধে থাকায় কাঁথি রূপ নিয়েছিল 'কন্টাই'। একটু সাহেব সাজতে চাওয়া লোকজন নিজেদের কন্টাইবাসী বলতেন। আর নির্ভেজাল বাঙালি মেজাজের মানুষরা বলতেন কাঁথি। প্রশাসনিক প্রয়োজনে কাঁথি মহকুমা ভাগ হয়েছে। দুটি মহকুমা এখন : কাঁথি আর এগরা। অবিভক্ত কাঁথি মহকুমার ইতিবৃত্ত রচনার সময়

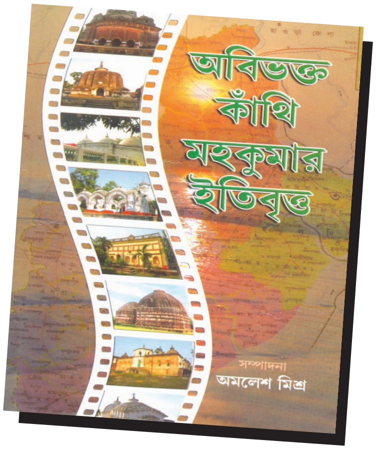


যথেষ্ট পরিকল্পনা করেই কাজ এগিয়েছেন উদ্যোক্তরা। এলাকার ভৌগোলিক প্রাকৃতিক পরিচয় জনবিন্যাস দিয়ে শুরু করা হয়েছে বিবরণ তৈরি। বিভিন্ন দিকে আলো ফেলা তারপর। আঞ্চলিক ভাষা ও লোকসাহিত্য, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কথা, স্বাধীনতা সংগ্রামে ভূমিকা, মহকুমার রাজনীতি, ধর্মচর্চা, ধর্মীয় সংগঠনে ধর্মস্থানের সঙ্গে ধর্মচর্চার আলোচনা। শিক্ষা বিকাশের কথা এসেছে ধাপে ধাপে। এসেছে সাহিত্যচর্চার কথা। নৃত্যগীতবাদ্য বা সঙ্গীতচর্চার বিভিন্নদিক নিয়ে আলোচনা হয়েছে। বলা হয়েছে অভিনয় চর্চার কথা। এসেছে অর্থনীতি ও অর্থনৈতিক বিবর্তনের কথা। ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্প, সমবায় আন্দোলনের কথা তুলে ধরা হয়েছে। খেলাধুলোতেও পিছিয়ে থাকেনি কাঁথি। সেকথাও আছে। ওই অঞ্চলের প্রত্ন-সম্পদও কম নয়। সে বিবরণও রয়েছে বিস্তারিতভাবে। কাঁথিতে গড়ে উঠেছে পর্যটনকেন্দ্র। সে ইতিহাস রয়েছে। কিছু বনেদী পরিবার সব অঞ্চলে থাকে। কাঁথির বনেদী পরিবারের কথা এসেছে। অসংখ্য মানুষের বসবাস যেখানে সেখানে চিকিৎসার ব্যবস্থা কেমন তার বিবরণও রয়েছে। বিচার ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা আছে। বিভিন্ন সময়ে কাঁথিতে এসেছেন গুণীজনেরা। তাঁদের কথা লেখা হয়েছে। ওই অঞ্চলের সাংস্কৃতিক বিবর্তন কথা যত্নে সাজানো। মহকুমার পুরসভাগুলির বিবরণ রয়েছে। কাঁথির যেসব বিখ্যাত মানুষ প্রয়াত হয়েছেন তাঁদের কথা রয়েছে। সেখানকার গণ আন্দোলনের কথাও বাদ পড়েনি। মহকুমার লোক-উৎসব নিয়েও আলোচনা হয়েছে।

লিখেছেন : মন্মথনাথ দাস, অসীমকুমার মান্না, হিরণ্ময় মাইতি, প্রশান্ত প্রামাণিক, প্রেমানন্দ প্রধান, হরিপদ মাইতি, সুনীলকুমার ঘোষ, গৌরহরি গিরি, নরেশচন্দ্র নন্দ, চিত্ত সাহু, স্বদেশরঞ্জন মণ্ডল, সুদর্শন খাটুয়া, হরিশচন্দ্র দাস, মনীষ সামন্ত, চন্দন আচার্য, হিমাংশু কুমার মাজী, স্বপনকুমার মণ্ডল, জ্যোতির্ময় কর, বরেন্দ্রনাথ পাত্র, সুনীলকুমার গিরি, তিমিরবরণ পান্ডা, কমলকুমার শ্রীমানি, পারিজাত পল্লব বিশ্বাস, অমলেশ মিশ্র। এ যেন প্রাণবন্ত বৃন্দগান। এক সুরে কাঁথির জয়কীর্তন নয়। একটা কথাও কাল্পনিক নয়। ইতিহাসের নথি খতিয়ান ভিত্তিক যাবতীয় বিবরণ।

লেখার সঙ্গে রয়েছে মানচিত্র। আর প্রচুর ছবি। তার মধ্যে আছে বিভিন্ন মন্দির। তারাপদ সাঁতরার মতো বিখ্যাত ইতিহাসজিজ্ঞাসু মানুষ বলেছিলেন, 'মেদিনীপুর জেলার ইতিহাসে কাঁথির গৌরবের কথা অনেকটা জুড়ে। সে কথা তুলে ধরা দরকার।' তারাপদ মেদিনীপুর জেলার পুরাতত্ত্ব নিয়ে বই লিখেছেন। তিনি জীবিত থাকলে খুব খুশি হতেন এই বইটি দেখে।

এখন কাঁথি প্রাণচঞ্চল এলাকা। পর্যটনের জন্যেই দীঘার গুরুত্ব বেড়ে চলেছে দিনেদিনে। পর্যটনের সঙ্গে বেড়েছে ব্যবসা। কাঁথির বিস্তৃত ইতিহাস জানতে না চাইলেও বেড়ানোর নেশায় কতজন ছুটে যাচ্ছেন দীঘায়। আশপাশে আরও কত পর্যটক টানার জায়গা। সেসব জায়গার ছবিও রয়েছে। যার দরুন বইটি হয়ে উঠেছে দলিলতুল্য বিবরণ।

সম্পাদক অমলেশ মিশ্র লিখেছেন : 'আমাদের মনোগত ইচ্ছা প্রত্যেক কাঁথিবাসীর বাড়িতে কাঁথির এই ইতিহাস গ্রন্থটি থাকুক।' আঞ্চলিক ইতিহাস-চর্চা যাঁরা করেন তাঁরাও হয়তো সংগ্রহ করবেন। জেলার বিভিন্ন গ্রন্থাগারে থাকবে। সম্পাদকমশাই প্রকৃত ইতিহাস সন্ধানীর মতোই বলেছেন, 'কাঁথির ইতিহাস আরও ভাল করে প্রণীত হোক এই বাসনা নিয়ে এই গ্রন্থ প্রণীত হলো।' কারণ ইতিহাস-রচনার কাজে কখনও পূর্ণচ্ছেদ টানা যায় না। নতুন নতুন তথ্য যোগ হতে থাকে ক্রমাগত। তবে 'অবিভক্ত কাঁথি মহকুমাবাসীর উদ্দেশে' উৎসর্গ করা বইটির মধ্যে যে শ্রম নিষ্ঠা ভালোবাসা এবং অতীতের প্রতি শ্রদ্ধা রয়েছে তার জন্যে উদ্যোক্তাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি আমরা।

**অবিভক্ত কাঁথি মহকুমার ইতিবৃত্ত।**
**অমলেশ মিশ্র সম্পাদিত।**
**দে পাবলিকেসনস্। ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩।**
**দাম : ১০০০ টাকা।**

# মেদিনীপুরে সরস্বতী পুজোয় থিম-এর লড়াই

মেদিনীপুর শহরে কলেজ রোডে এবারও যথারীতি সরস্বতী পুজো প্যান্ডেলগুলিতে থিমের লড়াই দেখতে মানুষের ঢল নেমেছিল। কিছু পোস্টার যা অগ্নিকন্যা, সুপিরিয়র, জাগরণ, প্রগতি, ব্যতিক্রম প্রভৃতি ক্লাবের প্যান্ডেলে দেখা গেল তা যুগোপযোগী সন্দেহ নেই। ব্যতিক্রম ক্লাবের নারী ও বৃক্ষের তুলনা করে উভয়কে রক্ষার সামাজিক দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দেওয়া সত্যিই প্রশংসাযোগ্য।

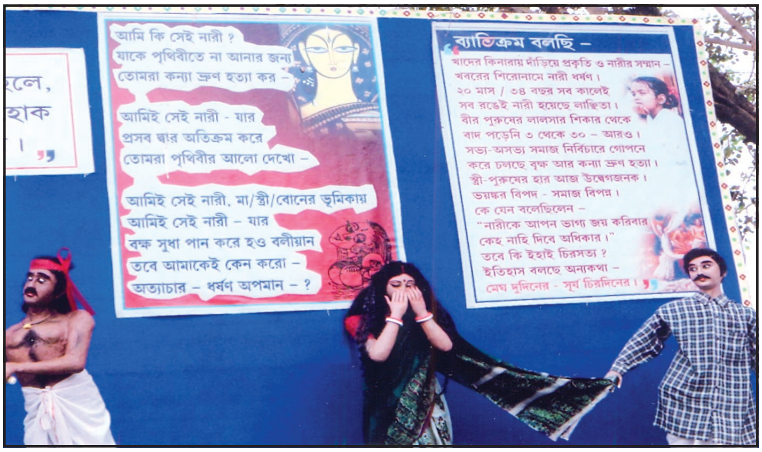


# পরলোকে জহরলাল চন্দ্র

গত ১৯ ফেব্রুয়ারি প্রয়াত হলেন বিখ্যাত স্বর্ণ প্রতিষ্ঠান পি সি চন্দ্র গ্রুপের চেয়ারম্যান জহরলাল চন্দ্র। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯০ বছর। ১৯২০ সালের ১২ নভেম্বর তাঁর

জন্ম। তিনি ছিলেন স্বর্ণ প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। স্বর্ণব্যবসার পাশাপাশি তিনি কেমিক্যাল এন্টারপ্রাইজেস, প্লাস্টিক ইন্ডাস্ট্রি, রবার প্ল্যানটেশন, হসপিটালিটি ও রিয়েল এস্টেটের ব্যবসায়ও যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেছেন। চিন্তা-ভাবনায় তিনি সর্বদাই সমসাময়িক সময়ের থেকে কয়েক কদম এগিয়ে থাকতেন। তাঁর মৃত্যু বাংলার শিল্পজগতে বলাই বাহুল্য গভীর শূন্যতার সৃষ্টি করবে।

×××

রতনদা চলে গেলেন। শ্রীরামপুরের শ্রীশ্রীমহাপ্রভুবাটীর একনিষ্ঠ সেবক সুভাষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি এলাকার সাধারণ মানুষের মধ্যে রতনদা বা রতনবাবু নামেই পরিচিত ছিলেন গত ২৫ জানুয়ারি, ৮৯ বছর বয়সে লোকান্তরিত হয়েছেন। জীবনের শেষ কয়দিন স্বল্পকালীন অসুস্থতার কারণে অপারগ হয়ে পড়া ছাড়া দীর্ঘসময় ধরে তিনি উক্ত মন্দিরে বিগ্রহের সেবা করেছেন ও মন্দিরকে আশ্রয় করে শ্রীরামপুরবাসী হিন্দু জনসাধারণের মধ্যে ধর্মজাগরণের কাজ করে গেছেন। তাঁর উপদেশ ছিল, সৎ অনাড়ম্বর জীবন যাপন কর, সময় করে প্রতিদিন প্রভুর সান্নিধ্যে এসে শান্তিলাভ কর। স্থানীয় বহু মানুষকে তিনি এইভাবে মন্দিরমুখী করেছেন ও মন্দিরের দায়িত্বপূর্ণ কাজে নিয়োজিত হতে প্রেরণা যুগিয়েছেন। সংঘের স্বয়ংসেবকদের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ছিল। ভারতবর্ষকে হিন্দুরাষ্ট্র করতে হবে এই বলে স্বয়ংসেবকদের তিনি প্রেরণা দিতেন। তাঁর দুই পুত্র বর্তমান। তাঁরা দুজনেই সংঘের স্বয়ংসেবক।

## সমাবেশ সমাচার

### স্মরণসভা

বি এম এসের পক্ষ থেকে গত ২৩ ফেব্রুয়ারি বিকেলে সংগঠনের কার্যালয় নরেশ ভবনে তাঁদের দুই কার্যকর্তা জয়দেব ঘোষ ও গুরুদয়াল সিং-এর স্মরণে স্মরণসভা আয়োজিত হয়। গত ৫ ফেব্রুয়ারি গুরুদয়াল ও ৮ ফেব্রুয়ারি জয়দেব ঘোষ (ঢোলে) প্রয়াত হন। জয়দেববাবু পেশায় শিক্ষক ছিলেন। গুরুদয়াল আইনজীবী। শ্রী ঘোষ কিছুদিন সঙ্ঘের প্রচারকও ছিলেন।

# সংস্কার ভারতী, দক্ষিণবঙ্গের শিল্পী সম্মেলন

সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গ (দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের) আঞ্চলিক শিল্পী সম্মেলনের দ্বিতীয় পর্যায় অনুষ্ঠিত হলো ২ ও ৩ ফেব্রুয়ারি হাওড়া জেলার তাঁতিবেড়িয়া সারদা শিশুমন্দির পরিসরে। ২২তম শিল্পী সম্মেলনের এই কার্যক্রমে হাওড়া, হুগলি, মেদিনীপুর, আসানসোল ও নদীয়া জেলার ১৪টি স্থান থেকে ১২৫ জন শিল্পী-সদস্য অংশগ্রহণ করেন।

২ ফেব্রুয়ারি সকালে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী, সুরকার প্রশান্ত ভট্টাচার্য, অখিল ভারতীয় নাট্য প্রমুখ বিকাশ ভট্টাচার্য, পূর্বাঞ্চল প্রমুখ সুভাষ ভট্টাচার্য। প্রান্তের সাধারণ সম্পাদিকা নীলাঞ্জনা রায়, সংগঠন সম্পাদক ভরত কুণ্ডু, অন্যতম সহ-সভাপতি আশিস কর্মকার, সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য নিখিল সমাদ্দার, ডাঃ বাসুদেব সাহা, দেবাশিস ভট্টাচার্য, কার্যালয় প্রমুখ শুভঙ্কর মুখোপাধ্যায়, সঙ্গীত সম্পাদক সমীর গুপ্ত প্রমুখ। সান্ধ্যকালীন প্রকাশ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে দুর্গাপুর ও মেদিনীপুর শাখা সমবেত সঙ্গীত পরিবেশন করে। ব্যান্ডেল শাখার তালবাদ্য, নবদ্বীপ শাখার কীর্তন, বীরশিবপুর, বাউড়িয়া ও উত্তরপাড়া শাখা নৃত্যালেখ্য পরিবেশন করে।

অনুষ্ঠানের শেষলগ্নে আশিস কর্মকারের একক সঙ্গীত এবং সুজিত চক্রবর্তীর যাদু প্রদর্শন সকলকে বিশেষ আকৃষ্ট করে। ৩ ফেব্রুয়ারি সকাল সাড়ে ১০টায় সম্মেলন স্থানে আসেন সংগঠনের ক্ষেত্রীয় সভাপতি ভিক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিশিষ্ট অতিথি স্বনামধন্য হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ও শল্যচিকিৎসক ডাঃ কুণাল সরকার। ভিক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বক্তব্যে সংস্কার ভারতীর সামাজিক ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন।

*স্বামীজীর জন্মসার্ধশতবর্ষ উপলক্ষে সারা দেশের সঙ্গে গত ১৮ ফেব্রুয়ারি এরাজ্যেও মহাসমারোহে বিভিন্ন স্কুলে পালিত হলো সূর্যনমস্কার কার্যক্রম। মহেশতলার বাটানগরের চারটি স্কুলে, হাওড়ার ৯টি স্কুলে ওইদিন সূর্যনমস্কার কার্যক্রম হয়। হাওড়ায় এই উপলক্ষে বের হয় 'বিবেক রথ'। সঙ্গে হাওড়ার থানামাখুয়া মডেল হাইস্কুল ও প্রসাদপুর হাইস্কুলের চিত্র (ডানদিক থেকে)।*

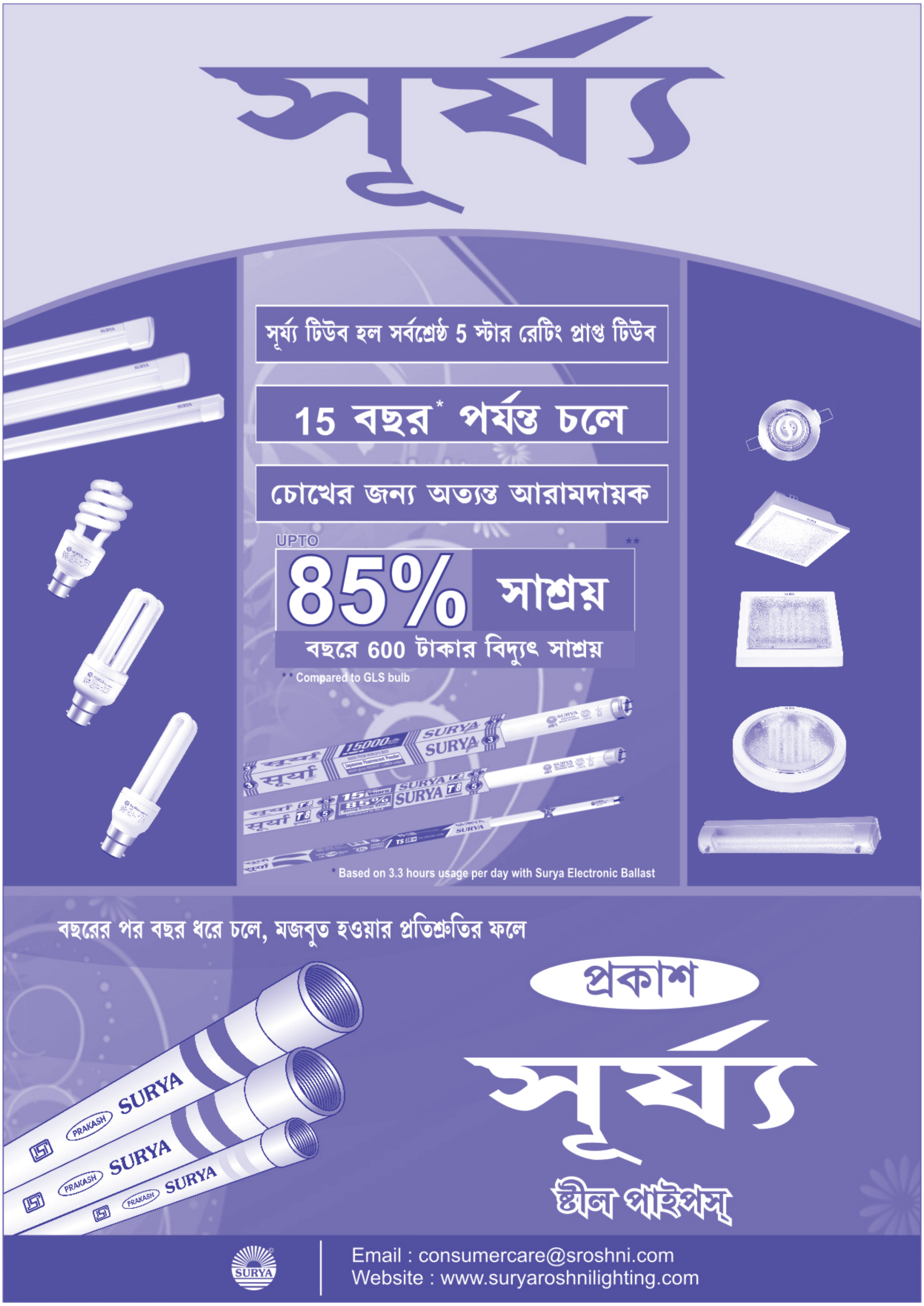
সূর্য্য
সূর্য্য টিউব হল সর্বশ্রেষ্ঠ 5 স্টার রেটিং প্রাপ্ত টিউব
15 বছর* পর্যন্ত চলে
চোখের জন্য অত্যন্ত আরামদায়ক
UPTO
85% সাশ্রয়**
বছরে 600 টাকার বিদ্যুৎ সাশ্রয়
** Compared to GLS bulb
* Based on 3.3 hours usage per day with Surya Electronic Ballast
বছরের পর বছর ধরে চলে, মজবুত হওয়ার প্রতিশ্রুতির ফলে
প্রকাশ
সূর্য্য
ষ্টীল পাইপস্
SURYA
PRAKASH
Email : consumercare@sroshni.com
Website : www.suryaroshnilighting.com

# পেলে, মারাদোনার সমকক্ষ নয় মেসি

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

দুনিয়া জুড়ে লিওনেল মেসিকে নিয়ে বল্গাহীন উচ্ছ্বাস ও আবেগ দেখে মনে হচ্ছে তিনিই যেন এই গ্রহের সর্বকালের সর্বোত্তম ফুটবলার। পেলে, মারাদোনা, ভি স্টিফানো, পুসকাস, ইউসেবিও, বেকেনবাওয়ার, যোহান ক্রুয়েফরা যেন তার পাশে কিছুই নয়। আর মেসি-ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডের মধ্যে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা তা কোনওকালে কোনও দুই ফুটবলারের মধ্যেও যেন দেখা যায়নি। আসলে এ যুগটা বড় বেশি মিডিয়া-শাসিত। মিডিয়া মানুষের চিন্তা-চেতনার নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠেছে। সমাজ-সভ্যতার সব কিছু ঠিক করে দিচ্ছে। এখন মানুষ আর উৎকৃষ্ট সাহিত্য পড়ে না। খবরের কাগজ পড়ে, খবরের চ্যানেল আর ইন্টারনেটে সার্ফ করে নিজেদের 'শিক্ষিত' করে তুলছে। এই প্রজন্ম যারা কিনা কর্পোরেট আর আই টি সেক্টরে চাকরি পাওয়াটাই জীবনের মোক্ষ বলে মনে করে তারা পেলে, মারাদোনার খেলাই দেখেনি।

আর্জেন্টিনার হয়ে বিশ্বকাপ না জেতা পর্যন্ত মেসিকে কখনই পেলে, মারাদোনার সঙ্গে একাসনে বসানো উচিত নয়। মিডিয়ার অন্তত এটুকু বুঝে পর্যালোচনা, সমালোচনা করা উচিত। পেলে চারটি বিশ্বকাপ খেলেছেন, তার মধ্যে ব্রাজিল তিনবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। আর তাঁর প্রায় সমকক্ষ দিয়েগো মারাদোনাও চারটি বিশ্বকাপ খেলেছেন। একটিতে প্রায় নিজের হাতে চ্যাম্পিয়ন করেছেন আর্জেন্টিনাকে। আর একবার রানার্স করিয়েছেন দেশকে। পেলে তবু পাশে পেয়েছিলেন বিভিন্ন সময়ে গ্যারিঞ্চা, ভাবা, ভিভি, রিভেলিনো, টোস্টাও-র মতো 'গ্রেট' ফুটবলারদের। মারাদোনা মেক্সিকো বিশ্বকাপে তার অর্ধেকেরও কম মাপের ফুটবলারদের নিয়ে দলকে টেনে নিয়ে গেছেন আর কী সব স্বপ্নের গোল করেছেন। মেসি দেশের হয়ে এরকম সাফল্য পেলে তবেই না এই তুলনা টানা যেতে পারে। ২০০৮-এ বেজিং অলিম্পিকে আর্জেন্টিনাকে চ্যাম্পিয়ন করতে বড় ভূমিকা পালন করেন মেসি। কিন্তু বিশ্বকাপে তাঁর সাফল্য কোথায়? অলিম্পিক বিশ্ব ফুটবলের সর্বোচ্চ মঞ্চ নয়, একমাত্র বিশ্বকাপ ছাড়া।

বিশ্ব ও ইউরোপীয় ক্লাব ফুটবলে মেসির যা সাফল্য তার নিক্তিতে বিচার করলে একমাত্র তুলনীয় কিংবদন্তী আলফ্রেডো ভিস্টিফানো। আর্জেন্টিনাজাত এই মহান ফুটবলার দেশে বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতে স্পেনে চলে আসেন ও রাজনৈতিক আশ্রয় পান। কিন্তু স্পেনের নাগরিকত্ব না পাওয়ায় বিশ্বকাপে খেলা হয়নি। যোগ্যতা অনুযায়ী হয় আর্জেন্টিনা বা স্পেনের হয়ে তাঁরও চারটি বিশ্বকাপ খেলার কথা। তার বদলে চ্যাম্পিয়ানস লিগ ও উয়েফা টুর্নামেন্ট খেলেই ফুটবল জীবন শেষ করতে হয়েছিল তাঁকে। আর এসবের মধ্যে টানা চারবার বিশ্বখ্যাত ক্লাব রিয়াল মাদ্রিদকে ইউরোপ সেরা করেছেন। সব মিলিয়ে ৬ বার চাম্পিয়ন হয়ে ইউরোপ সেরা হয়েছে এই ক্লাবটি তাঁর সময়ে। পঞ্চাশ দশকে পুসকাস-ডি স্টিফানো জুটি রিয়াল মাদ্রিদের আক্রমণ শৈলিকে অন্য উচ্চতায় তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন। অনেকটা সেরকমভাবেই মেসি-জাভি-ইনিয়েস্তা এই ত্রয়ী বার্সেলোনা ফরোয়ার্ড লাইনকে গোটা দুনিয়ার ডিফেন্ডারদের কাছে অপ্রতিরোধ্য করে তুলেছেন। বছরের পর বছর মেসির নেতৃত্বে 'বার্সা' অশ্বমেধের ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে সর্বত্র।

কিন্তু ফিফার ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিকরা শুধুমাত্র বার্সেলোনার হয়ে অতিমাত্রিক খেলার জেরে মেসিকে সর্বকালের সেরা প্লেয়ারের ফ্রেমে ঢোকাতে নারাজ। তারা মেসিকে সমকালীন 'গ্রেট' ফুটবলার বলছেন কিন্তু এখনও চিরকালীন কিংবদন্তীদের সঙ্গে একাসনে বসাতে রাজি নন। তিনি বিশ্বকাপে ধারাবাহিকতা দেখিয়ে দলকে উজ্জীবিত করুন ও অন্তত সেমিফাইনাল পর্যন্ত নিয়ে যান। বিশ্বকাপই একজন ফুটবলারের মানদণ্ড বিচারের শেষ কথা। পৃথিবীর অন্য সব ইভেন্টের ক্ষেত্রে অলিম্পিকই সর্বোচ্চ মানদণ্ড, কিন্তু ফুটবল এর ব্যতিক্রম। কারণ অলিম্পিকে ফুটবলটা হলো বিশ্ব ফুটবলে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার প্ল্যাটফর্ম। অলিম্পিক থেকে ফুটবলার উঠে আসে বিশ্বকাপ ফুটবলের লক্ষে, এই ভাবনা ও পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করে উন্নত সব দেশ। সেদিক থেকে দেখলে অলিম্পিকে মেসি উজ্জ্বল। কিন্তু বিশ্বকাপে (২০১০) সেভাবে কিছু করে দেখাতে পারেননি। পরবর্তী বিশ্বকাপ ব্রাজিলে, মেসির নিজের মহাদেশে আরও ভালভাবে বললে মেসির প্রতিবেশী দেশে। ২০১৪ বিশ্বকাপ তাই মেসির কাছে অগ্নিপরীক্ষা। আর মেসি নিজেও জানেন এই ব্যাপারটা।


## যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৭০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

**শব্দরূপ-৬৫৯** ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

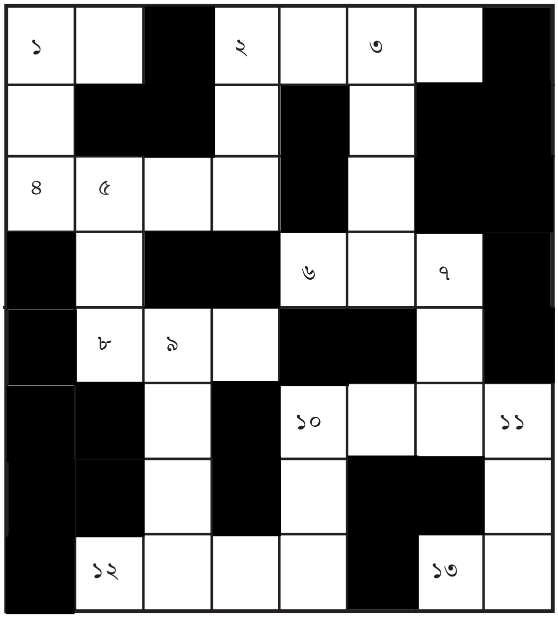


**সূত্র :**

**পাশাপাশি :** ১. চতুর্বর্ণের চতুর্থ, ২. কৃষ্ণের শঙ্খ, ৪. নৃত্যগীতাদি নিপুণা স্ত্রী, ৬. তন্দ্রা; ইন্দ্রজিৎ-পত্নী, ৮. যযাতির পিতা, ১০. ব্যাঙের ডাক, ১২. এক শ্রেণীর মিহি কাপড়, ১৩. দেবতা বা জীবের দশাবিশেষে কর্ম বা আচরণ।

**উপর-নীচ :** ১. সংস্কৃত 'মৃচ্ছকটিক' নাটকের রচয়িতা, ২. হিমালয়-মেনকার কন্যা, উমা, ৩. কৃষ্ণের জন্মতিথি, ৫. 'সব লোকে কয়— কী জাত সংসারে?' ৭. ঘোড়ার বল্‌গা, রাস, ৯. গোলমাল, তুমুল ব্যাপার, ১০. অশ্বশালা, ১১. দশমহাবিদ্যার এক, রাজরাজেশ্বরী; লেবু।

**সমাধান**
**শব্দরূপ-৬৫৬**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | পা | দো | দ | ক | | | স |
| ব | রি | | | দ | | | র |
| | জা | | | মা | লো | প | মা |
| ভূ | ত | ল | | | বা | | |
| | | হ | | | ন | ভ | গ |
| কু | শ | না | ভ | | | ব | |
| বে | | | র | | | লী | ন |
| র | | | ত | ক্ষ | শী | লা | |

**সঠিক উত্তরদাতা**

**অসীম দে,**
**সাহাপুর, মালদহ**
**শৌনক রায়চৌধুরী**
**কলকাতা-৯**

*শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।*

□ ৬৫৯ সংখ্যার সমাধান আগামী ২৫ মার্চ, ২০১৩ সংখ্যায়

যেখানে মহামারী হয়েছে, যেখানে জীবের দুঃখ হয়েছে, যেখানে দুর্ভিক্ষ হয়েছে— চলে যা সেদিকে ; নয়— মরেই যাবি। তোর আমার মতো কত কীট হচ্ছে মরছে। তাতে জগতের কি আসছে যাচ্ছে? একটা মহান উদ্দেশ্য নিয়ে মরে যা। মরে তো যাবিই ; তা ভাল উদ্দেশ্য নিয়েই মরা ভাল।

— স্বামী বিবেকানন্দ

(বাণী ও রচনা, ১/২৬)

—: সৌজন্যে :—

জনৈক শুভানুধ্যায়ী

জীবনের প্রতি পদে
থাকে যদি ডাটা
জমে যায়
রান্নাটা
DUTA
Chicken Mutton
Sabji Mix
kashmiri MIRCH POWDER
SUPER Cumin Powder
SUPER Turmeric Powder
Chilli Powder
SUPER Coriander Powder
BLACK Pepper powder
ডাটা
গুঁড়ো মশলা ও পাঁপড়
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুক্‌মী) প্রাঃ লিঃ

# গার্ডেনরিচ এলাকায় এখন অনেক বেশি সক্রিয় অপরাধচক্র

**নিজস্ব প্রতিনিধি।।** উনত্রিশ বছরে গার্ডেনরিচ এলাকা কোনওভাবেই সজ্জন পরিবেষ্টিত হয়ে ওঠেনি সেটা বোঝা গেল কদিন আগে পুলিশকর্মী তাপস চৌধুরী খুন হওয়ার ঘটনার পর। ১৯৮৪-র ১৮ মার্চ কলকাতা পুলিশের ডেপুটি কমিশনার বিনোদ মেহেতার উপর অপরাধচক্রের লোকজন মোটেই খুশি ছিল না। তাঁকে একেবারে সরানোর ছক তৈরি করে দুষ্টচক্র। তাদের পিছনে সক্রিয় ছিল ফরোয়ার্ডব্লক দলের এক মন্ত্রীর। তাঁর দুটো উর্দু কাগজও ছিল। তাঁর দুর্গতুল্য বাড়িতে বিনা অনুমতিতে কারও ঢোকার সুযোগ ছিল না। দুষ্কৃতীদের ধাওয়া করে সেই বাড়িতে ঢোকায় নেতাবাবুর তর্জনগর্জন পুলিশকে শুনতে হয়েছে, 'কার অনুমতিতে এ বাড়িতে পা রেখেছেন? বেরিয়ে যান।' এমন একটা লোকের বিরুদ্ধে কিছু করা যায়নি। পিছনে সিপিএম দলের মদত ছিল। অপরাধীদের সঙ্গে সমঝোতা বজায় রেখে পুলিশ বন্দর এলাকায় শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখুক— এমন অভিপ্রায় প্রশাসনের এবং মন্ত্রিদের থাকে। বিনোদ মেহতা অত্যন্ত সাহসী পুলিশ অফিসার। তিনি চেয়েছিলেন অপরাধীদের টিট করতে। কিন্তু অপরাধীদের জাল যে অনেক বিস্তৃত সে সম্বন্ধে হয়তো তাঁর যথেষ্ট ধারণা ছিল না। তাঁর ওইরকম 'কাজ দেখানো' মনোভাব পছন্দ করেনি পুলিশের একটা অংশ। নেতাবাবুরাও। তাঁরা চেয়েছিলেন বিনোদ মেহতাকে সরানোর ব্যবস্থা নিক গুণ্ডারাই।

১৯৮৪ সালের ১৮ মার্চ দিনের আলোয় অভিযান শুরু করলেন বিনোদ মেহতা। ছক সাজিয়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু একসময় দেখতে পেলেন তাঁর সঙ্গে দেহরক্ষী ছাড়া আর কেউ নেই। পুলিশের সব দল দূরে। এখনকার মতো সেলফোন হাতে হাতে ছিল না। কলকাতা পুলিশের ওয়াকিটকি ছিল না বিভিন্নজনের হাতে।

বিনোদ মেহতা বিচ্ছিন্ন হতেই তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল গুণ্ডারা। তাঁকে কেটে কুচি কুচি করে। তাঁর দেহরক্ষী মোক্তারকে কোতল করে গুণ্ডার দল। এরপর লোকদেখানো ধড়পাকড় চলে। ইদ্রিশ নামে একজনকে ধরা হয়। সে কিছু গোপন খবর জানত। তা ফাঁস

হওয়ার আশঙ্কায় লালবাজার লকআপে পুলিশ জেরার নামে ইদ্রিশকে পিটিয়ে মারে। সে সময় একমাত্র 'যুগান্তর' পত্রিকা খবরটা বের করে। একেবারে লালবাজারে ঘটা পুলিশের গোপন অপরাধের খবর ফাঁস করে দেন বিশিষ্ট সাংবাদিক অনিল ভট্টাচার্য। ছবি তোলেন সুদীপ কান্তি দে বিশ্বাস। ওই খবর ছবি সমেত ছাপা হতে রাজ্য সরকার বিনোদ মেহতা ইদ্রিশ হত্যা নিয়ে তদন্ত কমিশন বসাতে বাধ্য হয়।

সে সময় সেলফোন আসেনি। চার পাশে অসংখ্য গণমাধ্যমের লোকজন ঘুরঘুর করত না। রাম শ্যাম যদু মধুর পক্ষে ছবি তোলা সম্ভব হোত না। ফলে বিনোদ মেহতাকে অপরাধীদের হাতে খুন করিয়ে দেওয়ার ছক কষতে কোনও অসুবিধে হয়নি পুলিশের লোকদের। কোনও পুলিশকর্মীর শাস্তি হয়েছিল কি? হয়নি। বিনোদ মেহতার স্ত্রীকে রাজ্য সরকার একটা চাকরি দিয়েছিল— ওই পর্যন্ত। সেদিন পুলিশের যেসব লোক বিনোদ মেহতাকে হত্যার ছক কষেছিলেন তাঁর প্রায় সকলেই অবসর নিয়েছেন। কেউ কেউ মারা গেছেন। তাঁদের বাড়ির লোকজন কি জানেন কীরকম এক জঘন্য অপরাধে জড়িত ছিলেন নিকট আত্মীয়টি? অপরাধচক্রের যারা বিনোদ মেহতাকে খতম করে বন্দর এলাকায় নিজেদের দাপট বজায় রাখতে চেয়েছিল তারা এখন নেই। নতুন গুণ্ডারা এসে জায়গা দখল করেছে। রাজনীতির ছত্রছায়ায় থাকলে কাজের সুবিধে। আসলে গুণ্ডাদের কাছে মুনাফা ছাড়া আর কোনও নীতি নেই। তা বজায় রাখার জন্যে অনেক সময়েই নানারকম কৌশলের বা কঠোর ব্যবস্থা নিতে হয়। সেসব কাজ গোপনে চলে। জানাজানি হলেই মুশকিল। মুশকিল হলেও তা আসান করার লোকজন রয়েছে। নেতাবাবুরা বিনোদ মেহতা খুন হওয়ার পর এত বছর বন্দর এলাকা অপরাধমুক্ত ছিল? তা নয়, অপরাধীরা জাল আরও ভালোভাবে ছড়িয়ে দেয়। প্রয়োজনে খুন-খারাপি চলেছে।

কদিন আগে গার্ডেনরিচে পুলিশ অফিসার তাপস চৌধুরী খুন হয়ে গেলেন। কোনওভাবে খবর চাপা যায়নি। অনেক ভাবে ছবি তোলা হয়েছে। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী অনেক। উনত্রিশ বছর আগে বিনোদ মেহতার হত্যার সময় দল পাকিয়ে গুণ্ডারা ছুরি রামদা মাংস কাটা চপার নিয়ে হামলা করেছিল লুঙ্গি আর গামছায় অস্ত্র জড়িয়ে। একটাও আগ্নেয়াস্ত্র ছিল না। কাজ সারার পর গুণ্ডারা অস্ত্র গামছায় জড়িয়ে পান চিবোতে চিবোতে মন্ত্রীনেতার বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল পরম নিশ্চিন্তে।

তাপস চৌধুরী খুন হওয়ার পর বোঝা গেল বন্দর এলাকার অপরাধচক্র এখন আগের থেকে অনেক বেশি সক্রিয়। তাদের হাতে নানারকম অস্ত্র মজুদ।

বিনোদ মেহতা মারা গিয়েছিলেন রাজনীতিওয়ালা আর অপরাধচক্রের সমঝোতায়। সমস্ত প্রমাণ হাজির করেও সকলের শাস্তি হয়নি। তাপস চৌধুরীর হত্যাকারীদের খুঁজতে প্রমাণ দরকার হয়নি। যথেষ্ট পরিমাণ তথ্য প্রচারিত হয়েছে বিভিন্ন গণমাধ্যমে। পিছনে রাজনীতিওয়ালারা রয়েছে তাও স্পষ্ট। বন্দর এলাকার দুষ্কর্মধারা এখনও সমানে চলেছে। এবং তার পিছনে রয়েছে এক শ্রেণীর মুসলমান। ধারাবাহিকভাবে এরকম নৈরাজ্য চালাবার অবাধ সুযোগ দিয়েছে সবকটি রাজনৈতিক দল। কড়া দাওয়াই-এর ব্যবস্থা না হলে এরকম চলতেই থাকবে।

Swastika RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/48/2013-2015
04 March - 2013


# FOR INTERIORS THAT EVOKE ADMIRATION

For over two decades, Centuryply has been effortlessly redefining interiors into designer spaces with the most stunning range of products that reflect the very best of style, innovation and functionality.

**CENTURYPLY**
Quality that's a class apart!
Fortifying interiors with innovations like the first flexible ply, a 7 year termite-proof, pay back guarantee and many more…

**CENTURYVENEERS**
Exotic designs in wood!
Beautifying Interiors with an exclusive and wide range of Decorative veneers (only BWR available in India) & Senzura Styles, handpicked from around the world...

**CENTURYLAMINATES**
Style that stands out!
Trendsetting interiors with the widest range of laminates having myriad textures, stunning patterns and exquisite designs…

Also available:
**CENTURYMDF**
**CENTURYPRELAM**

CENTURYPLY®


দাম : ৭.০০ টাকা